আর এস এসকে
নিষিদ্ধ করাই নেহরুর
উদ্দেশ্য ছিল, গান্ধীহত্যা
অজুহাত মাত্র — পৃঃ ২৩

স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

বেলুড় মঠে মমতার
ভাষণে কলুষিত
এগারোই সেপ্টেম্বর
— পৃঃ ১১

৭১ বর্ষ, ৪ সংখ্যা।। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮।। ৭ আশ্বিন - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

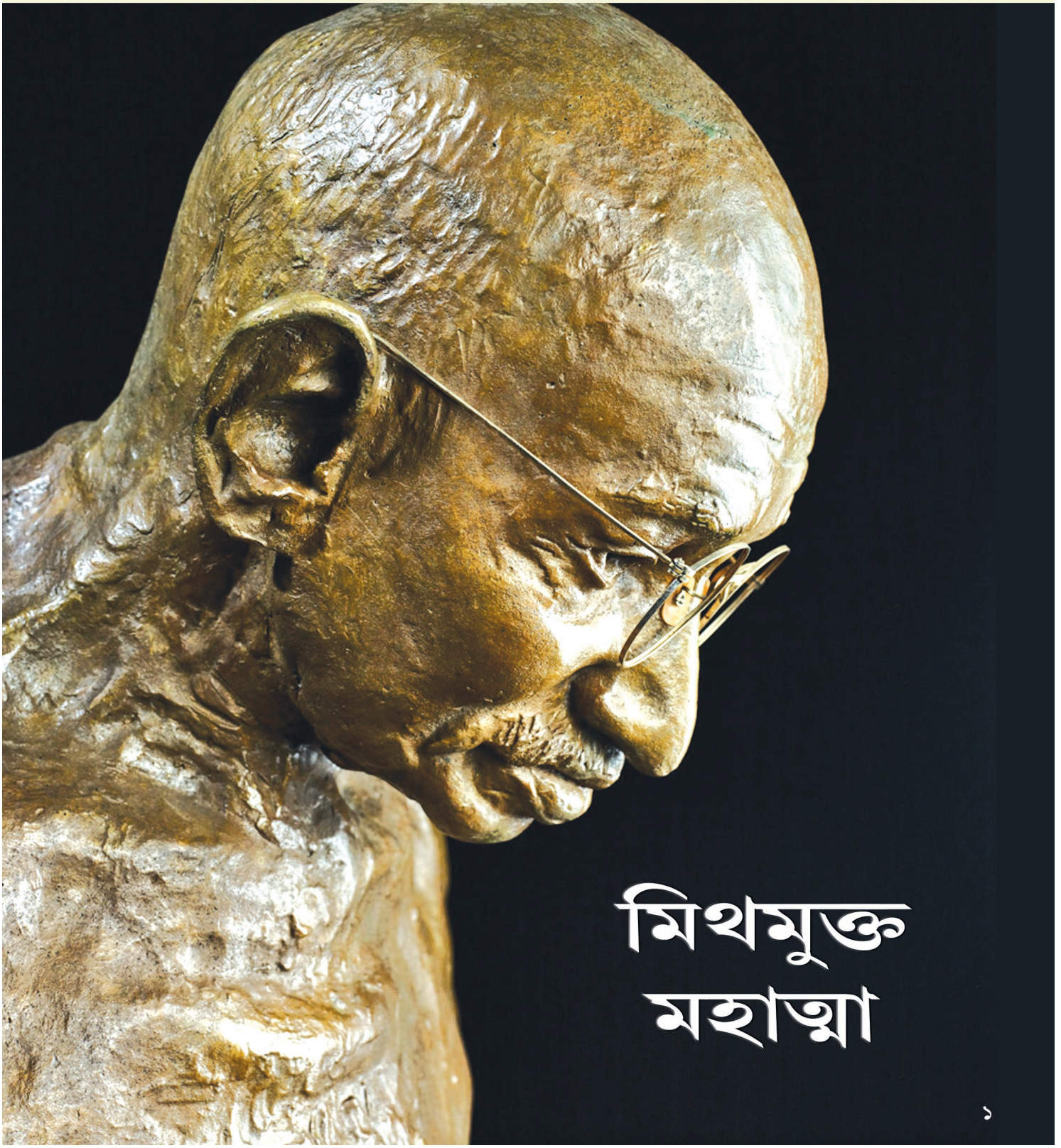

মিথমুক্ত মহাত্মা

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ৭ আশ্বিন, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

২৪ সেপ্টেম্বর - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

নীল-সাদা রং দিয়ে দুর্নীতির পাপ ঢাকা দেওয়া যায় না
▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ৬

খোলা চিঠি : '২০১৯, বিজেপি ফিনিশ' ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

অসভ্যতা বন্ধ করুন??? ▯ এম জে আকবর ▯ ৮

বেলুড় মঠে মমতার ভাষণে কলুষিত এগারোই সেপ্টেম্বর
▯ ড. জিষ্ণু বসু ▯ ১১

ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর বক্তব্য আজও প্রাসঙ্গিক
▯ ড. সুদীপ ঘোষ ▯ ১৩

স্বদেশ ভাবনায় পথিকৃৎ বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ▯ ১৫

রাহুল এবার বরং আপনি অভিযোগ প্রমাণ করতে শিখুন
▯ চন্দ্রভানু ঘোষাল ▯ ১৭

আর এস এস-কে নিষিদ্ধ করাই নেহরুর উদ্দেশ ছিল, গান্ধীহত্যা অজুহাত মাত্র ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ২৩

দেশভাগ গান্ধীজীর রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার ফল
▯ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস ▯ ২৭

ভারতের গো-সম্পদ ও গব্যযন্ত্রণা
▯ গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ২৯

সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর ▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা ▯ ৩১

দুর্গানামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ▯ মেঘদূত ভুঁই ▯ ৩৩

গল্প : গতকালের কামিনীরা ▯ জলজ বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩৫

আমাদের গান্ধীবাবা, ওরেবাব্বা
▯ নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায় ▯ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ▯ **অঙ্গনা : ২১** ▯

সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ **চিত্রকথা : ৪০** ▯ **খেলা : ৪১**▯

অন্যরকম : ৪২ ▯ **স্মরণে : ৪৫** ▯

সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

আগামী ১ অক্টোবর পূজা সংখ্যা। তাই ১লা অক্টোবর সাধারণ সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। ৮ ও ১৫ অক্টোবর স্বস্তিকা প্রকাশিত হবে। পূজাবকাশের জন্য ২২ ও ২৯ অক্টোবর স্বস্তিকা প্রকাশিত হবে না। ৫ নভেম্বর থেকে পুনরায় স্বস্তিকা প্রকাশিত হবে।

—সঃ স্বঃ

প্রকাশিত হবে
৮ অক্টোবর,
২০১৮

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৮ অক্টোবর,
২০১৮

৮ই অক্টোবরের আকর্ষণ

পিতৃপক্ষে তর্পণ

মহালয়ায় পিতৃপক্ষের শেষ। পরের দিন থেকে দেবীপক্ষের শুরু। প্রতিবছর মহালয়ার দিন সারা বিশ্বের অগণিত হিন্দু তর্পণ করেন। পিতামাতা থেকে শুরু করে যে কোনও পরলোকগত ব্যক্তি, এমনকী প্রাণী বৃক্ষ বা জড় পদার্থের জন্যও তর্পণ করা যায়। বহুত্ববাদী হিন্দু সংস্কৃতির এ এক বিস্ময়কর উদ্ভাবন। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় পিতৃপক্ষে তর্পণ। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যে যার নিজস্ব জগতের পরলোকগত অগ্রজকে সম্মান জানাবেন। তাঁদের পুনর্মূল্যায়ন করবেন। স্বস্তিকা হবে তাঁদের এই বিচিত্র তর্পণের সাক্ষী। লেখকসূচিতে রয়েছেন বিজয় আঢ্য, রমানাথ রায়, অভিজিৎ দাশগুপ্ত, লকেট চট্টোপাধ্যায়, জিষ্ণু বসু, অলোকা কানুনগো প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

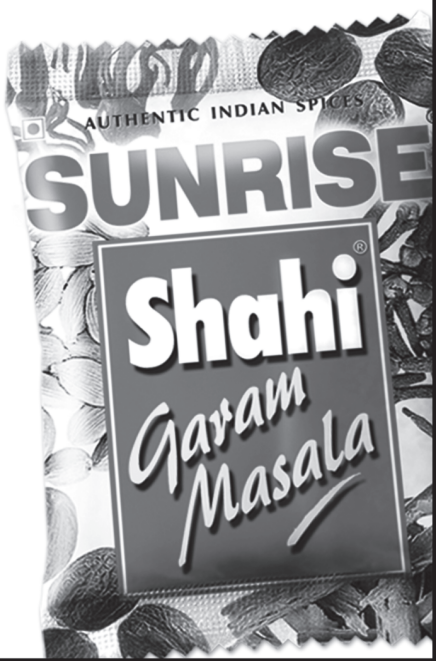

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অপপ্রচার বন্ধ হউক

এই বৎসরটি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্মের দেড়শত বৎসর। এই বৎসরটিতে গান্ধীজীর কর্মকাণ্ড এবং রাজনৈতিক ভাবাদর্শ লইয়া নানাবিধ চর্চা হইবে—ইহাই স্বাভাবিক। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এক চিরকালীন অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ইহা কেহই অস্বীকার করিবে না। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকিলেও গান্ধীজীকে বরাবরই দেশের সর্ব ধরনের রাজনৈতিক মতবাদের মানুষই শ্রদ্ধার আসনে রাখিয়াছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলিতেই হয়, স্বাধীনতার অব্যবহতি পরপরই গান্ধীহত্যাও অতীব দুঃখজনক ঘটনা ছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে গান্ধীজী বড়লোকের বৈঠকখানা হইতে মুক্ত করিয়া জনগণের সংগঠন করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই কংগ্রেস অবশ্য শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীকে ব্রাত্যই করিয়াছিল। এমনকী, মৃত গান্ধীকে অস্ত্র করিয়া তাহারা এদেশে হিন্দুত্ব আন্দোলনকে বিনষ্ট করিতেও পিছুপা হয় নাই। গান্ধী হত্যার সত্তর বৎসর পরেও মিথ্যা রটনার আশ্রয় লইয়া জাতীয়তাবাদী হিন্দু শক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে সদা তৎপর এই কংগ্রেস।

গান্ধী হত্যার পর জওহরলাল নেহরু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। নেহরুর অভিযোগ ছিল—আর এস এস গান্ধী হত্যার সঙ্গে জড়িত। যদিও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল এবং আরও বহু বিশিষ্টজন নেহরুর এই অভিযোগ মানিতে রাজি ছিলেন না। পরে, তদন্তেও প্রমাণিত হয়—গান্ধী-হত্যার সঙ্গে আর এস এসের কোনও যোগই ছিল না। বরং, সেই সময়ের তথ্য প্রমাণাদিতে ইহাই দেখা যায়—গান্ধী হত্যার বহু পূর্ব হইতেই নেহরু আর এস এসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিবার পরিকল্পনা করিতেছিলেন। গান্ধী হত্যা নিছক একটি অছিলা ছিল মাত্র।

আর এস এসের সঙ্গে গান্ধীজীর বরাবরই ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার সম্পর্ক ছিল। ১৯৩৪ সালে ওয়ার্ধায় আর এস এসের শিবির পরিদর্শন করিয়া গান্ধীজী অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারকে গান্ধীজী তাঁহার এই মুগ্ধতার কথা জানাইয়াছিলেন। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লিতে এক প্রকাশ্য সমাবেশে আর এস এসের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন গান্ধীজী। দেশভাগের সংকটপূর্ণ সময়ে গান্ধীজী আর এস এসের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকরের (শ্রীগুরুজী) সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। গুরুজীও গান্ধীজীর আবেদনে সাড়া দিয়াছিলেন। গুরুজীর নির্দেশেই গান্ধী হত্যার পরে সঙ্ঘের শাখাগুলিতে ধ্বজ অর্ধনমিত রাখা হইয়াছিল।

গান্ধীজীর প্রতি সঙ্ঘের এই শ্রদ্ধার মনোভাবকে নেহরু-গান্ধী পরিবার এবং তাদের বশংবদ এক শ্রেণীর বামপন্থী সেকুলার ঐতিহাসিক বুদ্ধিজীবী বিকৃতির আড়ালে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। গান্ধী হত্যায় আর এস এসের যে কোনওরূপ সংশ্রব ছিল না, তাহা প্রমাণ হইয়া যাইবার পরেও, নিছক রাজনৈতিক স্বার্থে এখনও গান্ধী-হত্যার সঙ্গে আর এস এসের নাম জড়াইবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে। বর্তমান কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী স্বয়ং এই অপপ্রচারটি করিয়া চলিতেছেন। গান্ধীজীর মতো ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করিয়া এই ধরনের মিথ্যা এবং অপপ্রচার অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। দরকার—সত্যটি সামনে আসিবার। তাহা হইলেই দেশের মানুষ বুঝিতে পারিবে, গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ডকে কাহারা এতদিন নিজেদের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করিয়াছে। মহাত্মার জন্মের দেড়শত বৎসরে মিথ্যার অবসান ঘটুক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সুভাষিতম্

যস্য পুত্রা বশা নিত্যং ভার্যা ছন্দানুগামিনী।
অভাবেঽপি সন্তুষ্টা স্বর্গস্তস্য মহীয়তে।। (চাণক্যনীতি)

যার পুত্রগণ সর্বদা বশে থাকে, স্ত্রীও স্বামীর অনুগত এবং অভাবের সময়েও সন্তুষ্ট থাকে, সেই ব্যক্তি পৃথিবীতে স্বর্গসুখ ভোগ করে।

নীল-সাদা রঙ দিয়ে দুর্নীতির পাপ ঢাকা দেওয়া যায় না

গূঢ় পুরুষের কলম

আর এস এস হিন্দু সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। হ্যাঁ, ঠিক ওই কথাটি তাঁর বশংবদ কলকাতার একটি বেসরকারি বাংলা টিভি চ্যানেলে দাবি করেছেন রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিদির স্নেহের পাত্র কংগ্রেস দলের সভাপতি রাহুল গান্ধী আগেই আর এস এসের সঙ্গে মুসলিম ব্রাদারহুডের তুলনা করেছেন। লোকসভার নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে নরেন্দ্র মোদী বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীরা আর এস এসের বিরুদ্ধে মাত্রাছাড়া কুৎসা ছড়ানো শুরু করেছেন। কেন? উত্তর আমার জানা নেই। কারণ, আর এস এস নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখে না। আর এস এস হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। কিন্তু বহুত্ববাদের নীতিতে বিশ্বাসী। কোনও বিশেষ ধর্মের মানুষদের তোষণ করে ভোট পাওয়ার রাজনীতির বিরোধী। গণতন্ত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করাতে আর এস এসের আপত্তি আছে। মোল্লা-মুয়াজ্জেমদের সরকারি বৃত্তি দেওয়ার বিরোধী। কারণ ভারতীয় সংবিধানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের 'পাবলিক মানি' খরচ করে বৃত্তি দেওয়াটা অসাংবিধানিক। ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ। মমতার সরকার শুধু কাঠ মোল্লাদের সরকারি বৃত্তি দেবে। মন্দিরের দরিদ্র পুরোহিতদের বঞ্চিত করবে এটা মানা যায় না। এই বৈষম্যের প্রতিবাদ করলে মমতা-রাহুল গান্ধী জুটি আর এস এসকে হিন্দু সন্ত্রাসবাদী বলে দেগে দেবে এটা চলতে পারে না। হিন্দু সংগঠন হলেই যদি 'সন্ত্রাসবাদী' হয় তবে দিদি নিজে রামকৃষ্ণ মিশন অযথা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন কেন? মঠ-মিশনে মুসলিম সন্তদের 'মহারাজ' করা হয় না কেন? এই ব্যাপারে দিদির বক্তব্য জানতে পারলে বাধিত হতাম। মঠ-মিশনের মহারাজরা গেরুয়া বসন পরেন। গেরুয়া রং দিদির অপছন্দের। গেরুয়াধারীদের সকলেই যদি হিন্দু টেররিস্ট হন তবে সেকথা স্পষ্ট ভাবে বলুন দিদি। বাঙালিরা আপনার মুখোশের আড়ালে আসল মুখটি চিনে নেবেন।

দিদি বহুত্ববাদী বিজেপিকে রুখতে দেশের সমস্ত অ-বিজেপি দলের কাছে জোট বাঁধার আবেদন করেছেন। তাঁর স্বপ্নের ফেডারেল ফ্রন্টকে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আনতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মমতা। তাঁর চ্যালেঞ্জ, বাংলার ৪২টি লোকসভার আসনের সবই দখল করবে তৃণমূল। দেশের সব অ-বিজেপি দল জোট করে নির্বাচনে প্রার্থী দেবে। শুধু পশ্চিমবঙ্গে জোট হবে না। এই রাজ্যে দিদির দল একাই লড়বে বিজেপির বিরুদ্ধে। আগামী জানুয়ারি মাসে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে দেশের সমস্ত অ-বিজেপি দলের মেগা শো হবে মমতার নেতৃত্বে। সারা দেশ তাকিয়ে থাকবে মমতার ডাকে দেশের কতজন হেভিওয়েট বিজেপি-বিরোধী নেতা নেত্রী ব্রিগেডের মঞ্চ আলো করে বসছেন দেখতে। জল্পনা চলছে, দেশ বাঙালি রাষ্ট্রপতি (প্রণব মুখোপাধ্যায়) পেয়েছে। এবার কি প্রথম বাঙালি প্রধানমন্ত্রী পেতে চলেছে? অবান্তর জল্পনা বা বিতর্ক। প্রশ্নটা হওয়া উচিত দেশ এবার কেমন প্রধানমন্ত্রী পেতে চলেছে। ভালো না মন্দ? যে কোনও আঞ্চলিক দলের প্রধানমন্ত্রী উন্নয়নের প্রশ্নে নিজের অঞ্চল বা রাজ্যের স্বার্থ সবার আগে দেখবেন। কারণ, তাঁর দলের শিকড়টা সেখানে। মমতা যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি বাংলার স্বার্থরক্ষাকেই অগ্রাধিকার দিতেন। নরেন্দ্র মোদী একটি শক্তিশালী সর্বভারতীয় দলের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। তিনি শুধু গুজরাটের স্বার্থ দেখেন না। তিনি সারা দেশের সব কটি রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থ দেখেন। মমতা বিজেপির বিরুদ্ধে, মোদীর বিরুদ্ধে অনেক কড়া কথা বলেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে না এমন অভিযোগ তিনি করেননি। এখানেই জাতীয় দলের প্রধানমন্ত্রী এবং ছোটো ছোটো আঞ্চলিক দলের প্রধানমন্ত্রীর পার্থক্য।

মমতার মতো বাস্তবজ্ঞানহীন নেত্রীর প্রধানমন্ত্রী হওয়াটা ভারতের পক্ষে আত্মহত্যার সমান। মমতা আবেগ ও জনমোহিনী রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন। তিনি জঙ্গলমহলে গিয়ে প্রতিশ্রুতি দেন সেখানে সাঁওতালি ভাষার পঠনপাঠনের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় করবেন চলতি শিক্ষাবর্ষে। দার্জিলিং পাহাড়ে নেপালি ভাষায় পড়ানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গড়বেন। ভেঙে পড়া কলকাতার মাঝেরহাট সেতুর বদলে এক বছরের মধ্যে নতুন সেতু গড়ে দেবেন। প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অলচিকি জানা অভিজ্ঞ শিক্ষক পাওয়া যাবে কোথায়?

একই প্রশ্ন পাহাড়ের প্রস্তাবিত নয়া বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে। এক বছরের মধ্যে চার লেনের উড়ালপুল গড়ার কোনও নজির ভারতে নেই। কারণ, উড়ালপুলের ভার বহনের ক্ষমতা কতটা তার পরীক্ষায় ছয় সাত মাস লাগে। তারপর আসল কাজ শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গে সরকারি নির্মাণ কাজ ঠিকাদাররা করতে চান না। কারণ প্রতি পদক্ষেপে পূর্ত কর্মীদের বিপুল টাকা ঘুষ দিতে হয়। মাঝেরহাট সেতু মেরামতির ফাইল গত দু' বছর পূর্ত বিভাগে আটকে ছিল ঘুষের টাকার রফা হয়নি বলে। একথা মমতা নিজমুখে নবান্নে সাংবাদিকদের বলেছেন। এই রকম দুর্নীতিবাজ প্রশাসনের পক্ষে এক বছরের মধ্যে মাঝেরহাট সেতু কীভাবে করা সম্ভব। আমার জানা নেই। সততার প্রতীক হয়ে আত্মপ্রচার না করে দিদি যদি বাস্তববাদী হতেন তবে সকলেরই উন্নয়ন হতো। শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হতো না। আবার বলছি, দিদি নীল-সাদা রঙ দিয়ে পাপ ঢাকা দেওয়া যায় না। দয়া করে বাস্তববাদী হোন এবং বাংলাকে বাঁচান। ■

‘২০১৯, বিজেপি ফিনিশ’

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,

সোমবার ফ্রাঙ্কফুর্টে নদীর পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতায় যখন ২০১৯-এর ভোটের কথা বলছিলেন তখন আমার খুব গর্ব হচ্ছিল। ভাবছিলাম এই তো আমাদের দিদি। বিদেশ বিভূঁইয়ে গিয়ে যার মন ভারতে, পশ্চিমবঙ্গে পড়ে থাকে। তবে দিদি আপনি বেশি বাইরে যাবেন না। দার্জিলিং গেলেন আর মাঝেরহাট ব্রিজ ভেঙে পড়ল। জার্মানি গেলেন, আর বাগড়ি মার্কেটে আগুন। কে যেন বলছিল— কোনও দিন আপনার অনুপস্থিতিতে সরকারটাই ভেঙে পড়বে। আমি কিন্তু বিশ্বাস করিনি।

তবে ওরা বলছিল— যে ভাবে দিদি বিজেপিকে ভয় পাচ্ছে তাতে ভেঙে পড়ার কথা নাকি আপনিই ভাবছেন। ফ্রাঙ্কফুর্টের নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আপনি— সব রাজনৈতিক দলকে এক ছাতার তলায় শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছেন আঞ্চলিক দলগুলির তরফে বিজেপিকে কঠিন লড়াইয়ের মুখে ফেলার জন্য। কিন্তু কে হবেন প্রধানমন্ত্রী?

আপনি বলেছেন, ভোটে মানুষের রায় জোটের পক্ষে গেলে নিজেদের মধ্যে কথা বলে প্রধানমন্ত্রী বেছে নেওয়া কঠিন হবে না। কিন্তু কেন মানুষ আপনার জোটের পক্ষে রায় দেবে? আপনি বলেছেন, তেলের দাম রোজ বাড়ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দরও আকাশছোঁয়া। চাকরি নেই। চাষি এবং শ্রমিকরা বিপন্ন। প্রশ্নের মুখে গণতন্ত্র।

স্লোগানগুলো দারুণ। কিন্তু দিদি এখনও কি ভোটারদের বোকা মনে করেন? আপনি কি জানেন না যে, কেন পেট্রল, ডিজেলের দাম বাড়ছে! জানেন না! তবে ভোটাররা কিন্তু জানে। আর চাকরির কথা বলছেন কিন্তু সেটা দেশের থেকেও খারাপ অবস্থা তো আপনার রাজ্যে। ভেবে দেখেছেন কি!

আমি জানি, আপনি ভেবেছেন। ভেবেই বুঝেছেন— হাল খারাপ সুতরাং, সব বুঝে শুনেই জার্মানি গিয়েও জোটের কথা ভাবছেন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য।

আপনার কথায়, দলিতদের উপরে আক্রমণের খবর মিলছে রোজ। উত্তরপ্রদেশে সামান্য কারণে খুন হচ্ছেন সংখ্যালঘুরা। ২০১৯ সালে ব্যালট বাক্সে এর জবাব দিতে সাধারণ মানুষ তৈরি হচ্ছেন বলেও আপনার দাবি। আর এই সূত্রেই সমস্ত দলকে একজোট হওয়ার ডাক। কিন্তু দিদি কেন কাচের ঘরে বসে ঢিল ছুঁড়ছেন! আপনার রাজ্যে সংখ্যালঘু, সংখ্যাগুরু সব খুনেই যে রোজ রেকর্ড হচ্ছে। গাজা কেসে বিজেপি কর্মী আর গ্যাঁজা কেসে আর এস এস প্রচারকদের ফাঁসানোর চেষ্টাই বলে দিচ্ছে, আপনি ভয় পেয়েছেন। ভয় পাচ্ছেন।

এবার দেখা যাক আপনার জোট থিওরি। আপনি বলেছেন, যেখানে যে আঞ্চলিক দলের ক্ষমতা ও প্রভাব বেশি, সেখানে তাদের কাজ হবে বিজেপিকে কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফেলা। প্রধানমন্ত্রী কে হবেন, সে বরং পরে নিজেদের মধ্যে কথা বলে ঠিক করা যাবে। আর এই ক্ষেত্রে নাকি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু আপনাকে যে কেউ বিশ্বাস করে না। কেন করবে বলুন তো! আপনার থিওরিতেই তো স্বার্থপরতা। নিজের রাজ্যে আপনিই সর্বেসর্বা হতে চেয়ে জোটের থিওরি দিয়েছেন। এর আগেও বিজেপি বিরোধী মহাজোট তৈরির প্রসঙ্গে একথা বলেছিলেন আপনি। নতুন স্লোগান তৈরি করেছেন— ‘২০১৯, বিজেপি ফিনিশ’।

হেব্বি হয়েছে দিদি। স্লোগানটা ফাটাফাটি। কিন্তু তবু আমার ভয় করছে। আমার দিদি দেশের কথা ভাবতে গিয়ে এই বাংলায় ঘাসফুলের গড় বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন তো! শুভ কামনা রইল দিদি।

—সুন্দর মৌলিক

অসভ্যতাটা বন্ধ করুন, রাফায়েল চুক্তির মধ্যে কোয়াত্রোচি কাকা নেই

অতিথি কলম

এম জে আকবর

সকলেই জানেন যে আবোল তাবোল বকা বন্ধ করার মহৌষধি হচ্ছে সাধারণ বুদ্ধি খরচ করা। সাধারণ বুদ্ধি খরচ করেই এটা জরিপ করে নিন ঠিক না ভুল। ৩৬টি রাফায়েল যুদ্ধবিমান যেগুলিতে আঘাত করার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি লাগানো রয়েছে ভারতীয় বিমান বাহিনীর সেগুলি সংগ্রহ করতে মোট খরচ পড়ছে ৫৮ হাজার কোটি টাকা এমনটাই জানা গেছে। কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর অভিযোগ অনুযায়ী এই চুক্তিতে ভবিষ্যতে কাজ কারবার করা হবে এমন অনুসারী কোম্পানির (যাকে অফসেট বলা হচ্ছে) মাধ্যমে ৪৫ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। আর এই দুর্নীতি সংঘঠিত হয়েছে একটি নির্দিষ্ট শিল্পপতিকে সুবিধে পাইয়ে দিতেই।

আচ্ছা, কেন কোনও বিদেশি অস্ত্র উৎপাদক কোম্পানি কারুর জীবন মধুময় করে তুলতে ৫৮ হাজার কোটি টাকার বরাতের জন্য ৪৫ হাজার কোটি টাকা ঘুষ দেবে, বলতে পারেন? সোজা কথায় এ অঙ্ক মেলে না। হ্যাঁ, আমরা জানি শ্রী গান্ধী এই নির্দিষ্ট সংখ্যাক ৩৬টি যুদ্ধবিমানের বরাতের কথাই বলছেন। অবশ্যই প্রস্তাবিত মোট ১২৬টি যুদ্ধ বিমানের কথা নিশ্চয় নয়। একথা জোর দিয়ে বলা যায় এই কারণে যে ২৭ জুলাই ৭.২২ মিনিটের একটি ট্যুইটের মাধ্যমে ধরে নেওয়া যায় তাঁর প্রথাসিদ্ধ চোখ টেপা কায়দায় লিখেছেন উদ্দিষ্ট শিল্পপতিটি এই লেনদেনে ২০ বিলিয়ন ইউএস ডলার ফয়দা করবে। তাঁর ভাষাটা বালখিল্য স্বরূপ হলেও কল্পনার উর্বরতা প্রশংসাই দাবি করে। বলা ভালো, এই ২০ বিলিয়নের গল্পটা লহমার মধ্যেই টুইটার থেকে উধাও হয়ে যায়। সম্ভবত শ্রী গান্ধীর মোটা মাইনের উপদেষ্টামণ্ডলী উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে টাকার অঙ্কটা উন্মাদের আঙ্কিক দক্ষতাকেও ছাপিয়ে গেছে। তাহলে সাধারণ বোধবুদ্ধি যদি এই মিথ্যে হিসেবকে বাতিল করতে পারে তাহলে আসল তথ্যের তাকে নস্যাৎ করে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে।

প্রথমেই আমাদের এই ঢক্কানিনাদের একবারে ভেতরে ঢোকা দরকার যেটা হলো

> সত্যি যতক্ষণ বুট-স্যুট পরে বেরোবে বলে তৈরি হচ্ছে ততক্ষণে মিথ্যে গোলার্ধের অর্ধেক পার করে উড়ে গেছে। কিন্তু উল্টোটা ঘটেছে এমন সত্যের জুতো পরা হয়ে গেছে সে লাথি মেরে মেরে মিথ্যেকে মাঠ ছাড়া করছে।

রাফায়েল 'বিমানের দাম নাকি বেশি।' ২০১২ সালে ক্ষমতাসীন ইউপিএ সরকার কেবলমাত্র অস্ত্রশস্ত্রহীন রাফায়েল বিমানের দর ৫৩৮ কোটি টাকায় রাজি হয়েছিল। এর সঙ্গে একটি ভবিষ্যৎ মূল্যবৃদ্ধির শর্ত দেওয়া ছিল। ওই শর্ত অনুযায়ী ২০১৫ সালের মে মাসে অনুমোদিত ও চুক্তিবদ্ধ মূল্য বৃদ্ধি অনুযায়ী বিমানের দাম দাঁড়ায় ৭৩৭ কোটি টাকা। বর্তমান সরকার শুধু মাত্র যুদ্ধ বিমানটি কোনও অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই (bare aircraft) এক বছর পরে ২০১৬ সালে ৬৭০ কোটি টাকায় কেনার চুক্তি করেছে অর্থাৎ ৯ শতাংশ কম দামে (৭৩৭-৬৭০ = ৬৭ কোটি কম)।

এই bare aircraft অর্থাৎ নগ্ন বিমান আক্ষরিক অর্থেই নগ্ন। এই বিমানে চালক বসার Cockpit যার সঙ্গে কেবল রাডার আছে। বাস্তবে এক পাইলটের একটি যাত্রীবিমান যে রাডারে শত্রুর উপস্থিতি দেখে চুপচাপ কর্মহীন অবস্থায় থেকে যাবে। এইবার প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণে সজ্জিত করে নানা ধরনের আকাশ-লড়াই, কসরত সমৃদ্ধ করে তুলতে ইউপিএ-র স্বীকৃত মূল্যমান অনুযায়ী উড়োজাহাজটির দাম দাঁড়াতো ২০১৩ কোটি প্রতি বিমান। বর্তমান সরকার বিমানটির আঘাত করার ক্ষমতায় বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। সংযুক্ত করিয়েছে বাড়তি প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি, performance based logistic জানানো ও তাড়াতাড়ি সরবরাহ করার শর্ত। এতসব করার পর সামগ্রিক মূল্য দাঁড়িয়েছে ২০ শতাংশ কম। রাহুল গান্ধী তুলনা করছেন একটি আঘাত-অক্ষম, শস্ত্রহীন বিমানের সঙ্গে

একটি অত্যাধুনিক তীব্র যুদ্ধ-ক্ষমতাসম্পন্ন বিমানের। এই বিমানগুচ্ছ ভারতীয় বায়ুসেনার অস্ত্র সম্ভারে যুক্ত হলে দীর্ঘদিনের এক ফাঁক ভরাট হবে। নিশ্ছিদ্র হবে নিরাপত্তা। আর তিনি কিনা এনিয়ে দেশবাসীকে ধোঁকা দিচ্ছেন? ২০১৫ সালের ১০ এপ্রিল ফরাসি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নরেন্দ্র মোদী দ্বিপাক্ষিক দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে একটি যুগ্ম ঘোষণা করেন যে রাফেল আরও 'better terms'-এ পাওয়া যাবে অর্থাৎ ইউপিএ-র আমলে যে চুক্তি হয়েছিল তার থেকে better terms-এ। দু' দেশের নেতাই এই মর্মে Inter Governmental Agreement (IGA) করেন যে, বর্তমানে যে বিমানটি সরবরাহ করা হবে তা পূর্বের 'Dassault Aviation'-এর বিমানের থেকে অধিক গুণসম্পন্ন যাতে হয় সেটিই উদ্দেশ্য। এছাড়া বলা হয় যেই মাত্র চুক্তিটি আই জি এ-র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে যাবে তখনই এটিকে যথোপযুক্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন বিভাগ দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নির্ণায়ক স্তরগুলিও পেরোতে হবে (due dilligence)। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সংগ্রহ সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রথা প্রকরণ পালন করা একটি আইনি বাধ্যকতার মধ্যে পড়ে। এর বিপরীতে রাহুল গান্ধীর পদ্ধতিটি হলো একেবারে কচিখোকা সুলভ শূন্যে কটা সংখ্যা ছুঁড়ে দিয়ে কাদা মাখানো। অবশ্যই ছিঁটেফোঁটা কোনও প্রমাণ দাখিলের বাধ্য বাধ্যকতা নেই। কিন্তু একটা দুরাশা আছে, এতটা কাদা যখন ছুঁড়েছি ধুলেও কিছুটা তো গায়ে সেঁটে থাকবে।

এবার অফসেট কোম্পানির কথায় আসা যাক। এই প্রথা অনুযায়ী সরবরাহকরা Dassault কোম্পানি ভবিষ্যতে বিমানগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজনে যন্ত্রাংশ সরবরাহের কাজ ভারতীয় কোম্পানিকে দিতে হবে। বলা দরকার এই সব কাজ কারবারের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের কোনও ভূমিকা নেই। রাহুল গান্ধী বারবার বলে আসছেন যে, একটি নির্দিষ্ট কোম্পানি যার আংশিক মালিকানা শিল্পপতি অনিল আম্বানীর হাতে আছে কেবলমাত্র সেই কোম্পানিটির আগামী তিন চার বছরের মধ্যে প্রয়োজন পড়লে রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত অনুযায়ী বরাতগুলি পাবে। এখানেও প্রকৃত ঘটনা হলো প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সংক্রান্ত ৭২টি কোম্পানি আছে যেমন সরকারি ক্ষেত্রে বি ই এল বা ডি আর ডি ও আবার বেসরকারি ক্ষেত্রে টাটা ইত্যাদি। খবর অনুযায়ী মোট ৩০ হাজার টাকার যে বরাত দেওয়া হবে তা ভাগ হয়ে যাবে এই ৭২টি কোম্পানির মধ্যে। এমন ৩০ হাজার কোটি টাকার যে বরাত ৭২টি কোম্পানির মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে কোনও একটি কোম্পানির পক্ষে তা থেকে ৪৫ হাজার কোটি টাকার লাভ তোলা যাবে এমনটা যিনি বলেন তাঁর স্থান উন্মাদাগারে।

হ্যাঁ, আপনি যদি কোনও কংগ্রেস নেতাকে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট প্রশ্ন করেন তা হলে তিনি নিচু স্বরে আপনাকে উত্তর দেবেন, না না কোনো ঘুষ দেওয়া নেওয়া হয়নি। তাঁরা জানেন সত্যিটা।

সত্যি বলতে কী আগাস্টা ওয়েস্ট ল্যান্ড হেলিকপ্টার বা HDW সাবমেরিন বা কুখ্যাত বোফর্স বিমানের ডিলের মতো বর্তমান ক্ষেত্রে কোনও কাকা কোয়াত্রোচি নেই। যাঁরা ইতিমধ্যে ভুলে গেছেন তাঁদের মনে করিয়ে দিচ্ছি কোয়াত্রোচি ছিলেন একজন ইটালিয়ান কারবারি যিনি ভারতের বাইরে কাজকারবার চালাতেন। কিন্তু রাজীব গান্ধীর আমলে তিনি গান্ধী পরিবারের এমন বন্ধু হয়ে উঠলেন যে তিনি বস্তুতপক্ষে সম্পর্কে রাজীবের কাকা হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৮০ সালে বোফর্স কামান কিনতে যে টাকা ঘুষ দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যস্থতাকারী ছিলেন কোয়াত্রোচি। বিগত ইউপিএ আমলেও তিনি শেষ অবৈধ সুবিধে নিয়ে গিয়েছেন— তাঁর আটকে দেওয়া ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি খুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ফেরত পেয়েছিলেন।

পণ্ডিতরা ঠিক কথাই বলে থাকে যে, মিথ্যে কথা বলার থেকে সত্যি কথা বলা অনেক সোজা। মিথ্যেকে সদাই উপযুক্ত সাফাই দিয়ে রক্ষা করতে হয়, টিকিয়ে রাখতে হয়। সত্য কিন্তু বদলায় না সে স্থির। এর অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির blog-এ, যেখানে তিনি রাহুল গান্ধীকে তীব্র আক্রমণ করে তাঁর নিজের ভাষণের উদ্ধৃতিই তুলে ধরেছেন। কর্ণাটকের সভায় মে মাসে রাহুল রাফায়েলের দাম বলেছেন ৭০০ কোটি। সংসদে এই দামের ফানুস চুপসে ৫২০ কোটি হয়। আবার সম্প্রতি রায়পুরে গিয়ে বলেছেন ৫৪০ কোটি। আবার জয়পুরে একই ভাষণ একবার ৫২০ একবার ৫৪০ কোটি বলেছেন। এই ডিজিটাল যুগে একটা কথা খুব উঠেছে— সত্যি যতক্ষণ বুট-স্যুট পরে বেরোবে বলে তৈরি হচ্ছে ততক্ষণে মিথ্যে গোলার্ধের অর্ধেক পার করে উড়ে গেছে। কিন্তু উল্টোটা ঘটেছে এমন সত্যের জুতো পরা হয়ে গেছে সে লাথি মেরে মেরে মিথ্যেকে মাঠ ছাড়া করছে।

(লেখক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী)

স্বস্তিকার গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান

আগামী ১ থেকে ১৫ই অক্টোবর স্বস্তিকার গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান চলবে। আগ্রহীদের নিজ নিজ এলাকার স্থানীয় প্রচার প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রয়োজনে স্বস্তিকা দপ্তরেও ফোন করতে পারেন।

— স্বস্তিকা প্রসার ও প্রচার প্রমুখ।

রম্যরচনা

স্বামী (স্ত্রীকে ফোন করে)— হ্যাঁ, গো মনে পড়ছে, গত বছর একটা গয়নার দোকানে এসেছিলাম আমরা?

স্ত্রী (খুব উৎফুল্ল হয়ে)— হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব মনে পড়ছে। তা হ্যাঁ গো, তুমি কি আবার গিয়েছ দোকানে?

স্বামী— সেবার তোমার একটা সোনার হার বেশ পছন্দ হয়েছিল, মনে পড়ে?

স্ত্রী (আরও উৎসাহী হয়ে)— হ্যাঁ। বেশ মনে পড়ে। কী সুন্দর ছিল হারটা।

স্বামী— আমার কাছে পয়সা ছিল না। আমি বলেছিলাম পরে কিনে দেব।

স্ত্রী— আমার সব মনে আছে। তুমি আজ গিয়েছ নাকি ওই দোকানে?

স্বামী— ওই দোকানের পাশে একটা সেলুন আছে। মনে পড়ছে তো? আমি ওই সেলুনে চুল কাটাতে ঢুকেছি। একটু দেরি হবে ফিরতে।

* * *

পল্টু ক্লাসে খুব মিথ্যে কথা বলে। একদিন মাস্টারমশাই পল্টুকে মিথ্যা কথা বলার জন্য খুব ধমক দিলেন। বললেন— এত মিথ্যে কথা তুমি শিখছ কোথা থেকে?

পল্টু— বাড়ি থেকে স্যার।

মাস্টারমশাই— বাড়ি থেকে শিখছ মানে?

পল্টু— বাড়িতে যে আনন্দবাজার রাখে।

উবাচ

"পাকিস্তানকে নিজের স্বভাব বদলাতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করতে হয়, তা পাকিস্তানকে বুঝতে হবে।"

রাজনাথ সিংহ
ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

জম্মুতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের নয়া সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে

"পাকিস্তানি সেনাবাহিনীই ইমরান খানকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেছে নিয়েছে। তিনি হলেন পাকিস্তানের সেনার হাতের পুতুল।"

ভি. কে. সিংহ
ভারতের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী

বণিক সংস্থা ফিকি-র সভায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে

"বিজেপি যদি সাম্প্রদায়িক দল হয়, তবে ৬ লক্ষ মুসলমান সদস্য কেন রয়েছেন? এই রাজ্যেই তো ৫০ হাজার মুসলমান সদস্য রয়েছেন।"

আলি হোসেন
বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার রাজ্য সভাপতি

এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে

"প্রচারের আলোর বাইরে থেকে ব্যক্তি নির্মাণের কাজ করে চলছে সঙ্ঘ।"

মোহনরাও ভাগবত
সরসঙ্ঘচালক, আর এস এস

দিল্লিতে বিজ্ঞান ভবনে এক আলোচনা সভায় বক্তব্যে

"যথেষ্ট সংখ্যক আসন যদি বহুজন সমাজ পার্টিকে না দেওয়া হয়, তাহলে আমরা একাই লড়ব।"

মায়াবতী
সভানেত্রী, বহুজন সমাজ পার্টি

সমাজবাদী পার্টি ও কংগ্রেসের সঙ্গে জোট প্রসঙ্গে

বেলুড় মঠে মমতার ভাষণে কলুষিত এগারোই সেপ্টেম্বর

ড. জিষ্ণু বসু

মন্দিরে মায়ের সামনে বসে রানি রাসমণি বিষয় চিন্তা করছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ কিছুক্ষণ দেখে গালে ঠাস করে এক চড় মেরেছিলেন। সেই রাসমণি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্নদাতা মালকিন ছিলেন। সেদিনই দক্ষিণেশ্বর থেকে ঘটিবাটি নিয়ে ঠাকুরকে বিদায় করে দিতে পারতেন। সঙ্গে উপরি হিসাবে লেঠেল দিয়ে একটু বাঁশডলা। কিন্তু ঠাকুর চড় মারার আগে এতশত ভাবেননি। যাঁরা তৎগত চিত্ত, যাঁরা একটা গোটা সমাজকে উদ্ধার করতে পৃথিবীতে এসেছেন তাঁরা ভাবেন না। ঠাকুরঘরে বসে শুধু ঈশ্বর চিন্তা করার কথা; বিষয় চিন্তা করলেই থাপ্পড়। কে মালিক, কে অন্নদাতা এসব ভুলে সঠিক কাজ করার সাহস ছিল বলেই তো তিনি অবতার বরিষ্ঠ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। রানি রাসমণিও কিন্তু চড় খেয়ে তাঁর ক্ষমতার দাপট দেখাননি। মন্দিরের ভেতরে বিষয় চিন্তা করতে নেই, রাজনীতির দুর্গন্ধময় পাঁক ঢোকাতে নেই—তিনি ভুল করেছেন। তাই ঠাকুর শাসন করেছেন। এই কথা মেনে নেওয়ার মতো বড় হৃদয়, তেমন আধার ছিল তাঁর।

ভগিনী নিবেদিতা বিলেতের যশ, ঐশ্বর্য ছেড়ে ভারতে এসেছিলেন। বিলেতের কাগজে স্তম্ভ লেখিকা ছিলেন। মন্টেসরিকে কিন্ডরগার্টেন স্কুলের ভাবনাটা হয়তো মার্গারেট দিয়েছিলেন, প্যারিসে ১৯০০ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনে এশিয়া বিষয়ক বিভাগের সচিব প্যাট্রিক গিডিসের সহায়ক হিসাবে মনোনীত হয়েছিলেন মার্গারেট নোবেল। এত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পায়ে ঠেলে তাঁর গুরু, তাঁর 'রাজা'র পথে জীবন দিতে ভারতে চলে এলেন। প্রথম মেয়েদের স্কুল খুললেন। ভারতবর্ষের নবজাগরণের যুগে শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্প প্রতিটি ক্ষেত্রে নিবেদিতার ভূমিকা প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে ভগিনী দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও ভূমিকা নিয়েছিলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনেরও প্রেরণাস্থল হয়ে উঠেছিলেন তিনি। সেখানেই গোল বাঁধল। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মধ্যে থেকে কেউ রাজনীতি করতে পারবেন না। স্বামীজীই নিয়ম বেঁধে দিয়ে গিয়েছিলেন। তাই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ছাড়তে হয়েছিল নিবেদিতাকে। সেই আশ্রম ছেড়ে যেতে তাঁর অনেক কষ্ট হয়েছিল। জীবনের শেষ কয়েকটা দিন তার অসম্ভব অর্থকষ্টে কেটেছে। দার্জিলিং শহরের রায় ভিলাতে আচার্য জগদীশচন্দ্রের সহধর্মিণী অবলা বসু গিয়ে দেখলেন, নিবেদিতা প্রায় পনেরোদিন দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাননি। তার কিছুদিন পরেই মাত্র ৪৪ বছর বয়েসে দেহ রাখলেন নিবেদিতা।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মঞ্চে রাজনীতির কথা বলা যাবে না সেই নির্দেশ মানতেই তো নিবেদিতার এতবড় ত্যাগ। মিশন রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকবে। এ বিষয়ে কোনও সমঝোতা হবে না। স্বামীজী বলতেন, "সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায় কিন্তু কোনও কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা ঠিক নয়।" 'কোনও কিছু'টা যেন ফিকে না হয়ে যায়। রামকৃষ্ণ মিশন বহু ঝড়ঝাপটার পরেও এই 'কোনও কিছু'-কে ফিকে হতে দেয়নি। না কোনও প্রবল শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তির ভয়ে, না কোনও বিপুল অনুদানের প্রলোভনে।

> “মুখ্যমন্ত্রী বেলুড়ের পবিত্র অনুষ্ঠানটিকে তাঁর রাজনৈতিক প্রচারের কাজে ব্যবহার করেছেন। বেলুড় মঠে দাঁড়িয়ে একটি নিপাট রাজনৈতিক বক্তব্য রেখেছেন। তার বেশিরভাগটাই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ, মিথ্যাচার আর কিছুটা অজ্ঞতা প্রসূত।”

রামকৃষ্ণ মিশন সারাদেশে অগণিত সেবা প্রকল্প চালায়, অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। কত হাসপাতালে হাজার হাজার দুঃস্থ, দরিদ্র মানুষ ঝাঁ চকচকে নার্সিং হোমের মতো সেবা পান। ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ভাবনাতে দেশকে গড়ার কাজে, হিন্দুত্বের অমর মানবতার বাণী সারা পৃথিবীকে শোনাবার জন্য প্রতি বছর কত মেধাবী ছেলে-মেয়ে সংসারের মায়া ছেড়ে সন্ন্যাস নিচ্ছেন। এই নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসীকুলের মূল সাধনামন্ত্র শিবজ্ঞানে জীবসেবা।

এই সেবাকাজে এরাজ্যে এক এক সময় এক এক রাজনৈতিক শক্তি বাধা দিয়েছে। দেবদুর্লভ সন্ন্যাসীদের কত কষ্ট পেতে হয়েছে। বামপন্থীদের চক্ষুশূল ছিল মিশন, আর তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পার্টির লোককে নিতে হবে। পার্টির কথায় চলতে হবে এমন দাবিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল মিশন। অত্যাচার এমন ভয়ানক হয়েছিল যে, সত্তরের দশকে কয়েক মাসের জন্য বন্ধও করে দিতে হয়েছিল নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক বিদ্যালয়। কিন্তু সিপিএমের কাছে মিশন মাথা নোয়ায়নি। ধীরে ধীরে যাদের বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা ধর্মের আফিংয়ের আখড়া বলত, সেই মিশনের স্কুলগুলি থেকেই মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় হতে লাগল। সিপিএম তারপর হাল ছেড়ে দিল। নরেন্দ্রপুরে, রহড়ায়,

সরিষায় ছেলে-মেয়েরা স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনায় শিক্ষা পেয়ে হেসে খেলে বড়ো হতে লাগল।

গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের বেদীভবন সংলগ্ন জমি ১৯৯৮ সালের ২৫ অক্টোবর,; মিশনের হাতে আসে কোর্টের রায়ে। কিন্তু সেদিন বর্তমান তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কয়েকশো উচ্ছৃঙ্খল জনতা গোলপার্ক ইন্সটিটিউট আক্রমণ করে। মমতা ব্যানার্জির উপর পুলিশ গুলি চালিয়েছে এমন মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে লোক খেপানো হয়। মমতা সংবাদমাধ্যমে বলেন যে, রামকৃষ্ণ মিশন জমির প্রমোটারি করছে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে 'বেদীভবন উন্নয়ন কমিটি' তৈরি হয়। তারা কলকাতা হাইকোর্টে মিশনের বিরুদ্ধে মামলা করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সরদার আমজাদ আলি উন্নয়ন কমিটির পক্ষে উকিল হিসাবে এজলাসে দাঁড়ান। কিন্তু মহামান্য সমরেশ ব্যানার্জির আদালত রামকৃষ্ণ মিশনকে সম্পূর্ণ নির্দোষ ঘোষণা করেন। আবার শুরু হয় গোলপার্ক নির্মাণ কার্য।

মুখ্যমন্ত্রী হবার পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে নিঃশর্তে ক্ষমা চাইতে পারতেন তাঁর ১৯৯৯ সালের আচরণের জন্য। তাতে হয়তো তাঁর কৃতকর্মে কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হতো। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা তাকে ক্ষমা করেছেন। সেদিনের তার মিথ্যাচারের কথা মনে না রেখে, একাধিক অনুষ্ঠানে তাঁকে সম্মানের সঙ্গে আমন্ত্রণ করেছেন। বেলুড়ে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তিনি ডাক পেয়েছেন। সম্প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার ১২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানেও তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে বেলুড় মঠ।

মুখ্যমন্ত্রী সেই পবিত্র অনুষ্ঠানটিকে তাঁর রাজনৈতিক প্রচারের কাজে ব্যবহার করেছেন। বেলুড় মঠে দাঁড়িয়ে একটি নিপাট রাজনৈতিক বক্তব্য রেখেছেন। তার বেশিরভাগটাই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ, মিথ্যাচার আর কিছুটা অজ্ঞতা প্রসূত। কল্পনার রসে জারিয়ে বিযোদ্গার করেছেন বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বিশ্ববিজয়ের দিন। সেই অতি পবিত্র ১১ সেপ্টেম্বরকে কলুষিত করেছে তাঁর স্বার্থমগ্ন রাজনৈতিক ভাষণ।

প্রথমত, তিনি ইতিহাস না জেনে অসত্য কথা বলেছেন। কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ কেন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশনের অধীনে কখনোই ছিল না। ১৯৬২ সালে ভারত-চীনের যুদ্ধের পরে হতোদ্যম ভারতবর্ষকে আবার আত্মশক্তিতে জাগানোর জন্য স্বামীজী ভাবনায় একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এগিয়ে আসেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তদানীন্তন সরকার্যবাহ একনাথ রানাডে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে বিবেকানন্দের স্মৃতি বিজড়িত সেই শিলাখণ্ডে তৈরি হয় এক অপূর্ব সমুদ্রমন্দির। একনাথজী কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি, বেলুড় মঠে দিনের পর দিন স্বামী বিবেকানন্দকে অধ্যয়ন করেছেন। বিবেকানন্দ কেন্দ্র তৈরির জন্য কলকাতায় অস্থায়ী অফিস তৈরি হয়েছিল। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারি উদ্বোধন হলো বিবেকানন্দ কেন্দ্রের। সেই শিলাখণ্ডের উপর অপূর্ব সমুদ্র মন্দিরের। এসেছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের ১৩তম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি। তারপর থেকে পাহাড়ে, জঙ্গলে, দুর্গমতম স্থানে স্বামীজীর বাণী, আদর্শকে পৌঁছে দেবার কাজ করে চলেছে বিবেকানন্দ কেন্দ্র। ঠাকুর-মা- স্বামীজীর আদর্শকে ভারতের প্রতি গ্রামে, প্রতি শহরে পৌঁছোনোর দায়িত্ব নিয়েছে বিবেকানন্দ কেন্দ্র।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বেলুড় মঠ দখল করে নেওয়ার পরিকল্পনা চলছে। তিনি জানলেন কীভাবে? মঠ ও মিশনের কেউ তাকে বলেছেন? বললে বলুন, কে কীভাবে দখল করতে চাইছে বেলুড় মঠ? সারা ভারতবর্ষের মানুষ তার প্রতিকার করবে! বলুন আপনি! যদি না বলতে পারেন তবে আপনি অসত্য বলেছেন। আপনি যখন এই কথা বলছিলেন, তখন বেলুড়ের গুরুমহারাজের মন্দিরের ঘণ্টায় স্বামীজীর কথা ধ্বনিত হচ্ছিল— 'সত্যের জন্য সব ত্যাগ করা যায়, কিন্তু কোনও কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা ঠিক নয়!'

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, শিকাগোতে তিনি আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন, কিন্তু কেউ চক্রান্ত করে তাঁর যাত্রা ভঙ্গ করেছে। বাস্তব ঘটনা হলো, বেদান্ত সোসাইটি তাদের অনুষ্ঠান সাময়িকভাবে বাতিল করেছে। শিকাগো শহরে বেদান্ত সোসাইটির যে মঠ তা বেলুড় মঠের সমান বড় জায়গা নিয়ে। 'হিন্দু টেম্পল অব গ্রেটার শিকাগো' আর 'বেদান্ত সোসাইটি' ওই শহরের অনাবাসী ভারতীয়দের অতি গর্বের ধন। ইলিনয় স্টেটের অনাবাসী হিন্দুদের ভাবনাকে অবশ্যই সম্মান দেবে বেদান্ত সোসাইটি। আসলে মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থা লেডি ম্যাকবেথের মতো হয়েছে। তিনি এরাজ্যে হিন্দুদের যে ক্ষতি মাত্র ৭ বছরে করেছেন তা স্বাধীনতার পরে ৭ দশকে কেউ করতে পারেনি। এ রাজ্যকে জেহাদি সন্ত্রাসের আতুড়ঘর বানিয়েছেন তিনি। কুখ্যাত মৌলবাদী নেতাদের এ রাজ্যের ক্ষমতার অলিন্দে নিয়ে এসেছেন খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণের জন্য। কালিয়াচকের পুলিশ ফাড়ি জ্বালানোর ঘটনা, ধূলাগড়ের হিন্দু নির্যাতনের ঘটনার জন্য সারা পৃথিবীর হিন্দুরা তাঁকেই দায়ী করেন। কারণ জেহাদি মৌলবাদকে তিনি এ রাজ্যে হাতে ধরে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই তিনি ম্যাকবেথের মতো নিজের হাতে সব সময় রক্ত দেখতে পান। নিজের অজান্তেই বলে ওঠেন, 'এত রক্ত কেন?' সেই পাপবোধেই তিনি শিকাগোর বেদান্ত সোসাইটির সিদ্ধান্তের বিষয়ে এমন কথা বলেছেন।

সব শেষে বলা যায় যে, ওই অনুষ্ঠান বেলুড় মঠে হচ্ছিল। স্বামীজীর পবিত্র স্মৃতিমেদুর পরিবেশে কি এমন নোংরা রাজনীতি আনা যায়? তিনি তো সম্পূর্ণ একটি রাজনৈতিক বক্তব্য রাখলেন! সেদিন তিনি 'এভাবে আমাকে আটকানো যাবে না', 'বিজেপি-আর এস এস চেয়েছিল শিকাগো শহরে একটাই অনুষ্ঠান হোক' এমন বিশুদ্ধ রাজনৈতিক বক্তব্য রেখেছেন। সেদিন দর্শকাসনে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মনে বারবার ভগিনী নিবেদিতার মুখ ভেসে উঠছিল। সেই তেজদীপ্ত বিদুষী নিবেদিতার সোনার প্রতিমা নয়। দার্জিলিংয়ে রায়ভিলায় মৃত্যুর আগে অনাহারক্লিষ্ট কঙ্কালসার ৪৪ বছরের নিবেদিতার মুখ। যিনি কেবলমাত্র রাজনৈতিক সংস্রবের জন্য মিশনের নিরাপদ ছায়া ছেড়ে চৈত্রের নির্মম রোদে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ওই সর্বত্যাগী মহামানবীর জন্মের সার্ধশতবর্ষে এমনই এক কলঙ্কময় ঘটনা ঘটে গেল বেলুড়মঠের পূতপবিত্র ভূমিতে! ■

ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর বক্তব্য আজও প্রাসঙ্গিক

ড. সুদীপ ঘোষ

আজ থেকে ১২৫ বছর পূর্বে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর অমেরিকার শিকাগো শহরে পৃথিবীর প্রথম ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। চলেছিল ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের অংশগ্রহণ ও ভাষণ ভারতবর্ষ তথা বিশ্ববাসীর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত দুটি। প্রধান প্রধান ধর্মের প্রতিনিধিদের একই সভায় একত্রিত করা এবং বিভিন্ন ধর্ম পরস্পরকে কীভাবে আলোকিত করছে তা আলোচনা করা। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল কিছু গোঁড়া খ্রিস্টান এই সভার সমালোচনা করা শুরু করল, কারণ তাদের মতে খ্রিস্টধর্মই একমাত্র স্বীকৃত ধর্ম এবং ধর্মমহাসভা ডেকে অন্য ধর্মকে তার পাশে বসানোর অর্থ যিশুখ্রিস্টের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আমেরিকার শিক্ষিত জনসাধারণ ধর্মমহাসভার পরিকল্পনাকে সর্বতোভাবে সমর্থন করেছিলেন এবং সাগ্রহে তার জন্য প্রতীক্ষা করেছিলেন।

ধর্ম মহাসভা শুরু হলো ঠিক সকাল ১০টার সময় ১০টি ধর্মের উদ্দেশ্যে দশটি ঘণ্টাধ্বনির মাধ্যমে। এই দশটি ধর্ম ছিল— ইহুদি ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, তাও ধর্ম, কনফুসিয়াসের ধর্ম, সিন্টো ধর্ম, পারসিক ধর্ম, ক্যাথলিক ধর্ম ও প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম। মহাসভায় কয়েক হাজার শ্রোতাকে দেখে স্বামীজী প্রাথমিকভাবে ঘাবড়ে গেলেন। সকালের অধিবেশনে তিনি বক্তৃতা করলেন না। দুপুরের অধিবেশনে চারজন বক্তা বক্তব্য রাখার পর তিনি মনে মনে দেবী সরস্বতী এবং তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্মরণ করে বক্তব্য শুরু করলেন এই বলে, "sisters and brothers of America"— মুহূর্তে করতালিতে ভরে গেল অডিটোরিয়াম। টানা দু'মিনিট করতালি চলার পর তিনি তার বক্তব্য শুরু করলেন।

যার মর্মার্থ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'যত মত তত পথ' বাণী। তার আগের বক্তারা মূলত তাঁদের ধর্ম যে মহান ও অন্যান্য ধর্ম যে হীন— এটি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে গেছেন। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি দীপ্তকণ্ঠে সর্বধর্মের ভাই-বোনেদের নিজের করে নেওয়ার যে হৃদয় ও দর্শন দেখিয়েছিলেন তাকে কুর্নিশ জানাতে প্রায় দু'মিনিট ধরে চলে করতালি।

আজ হিন্দুরা নিজের দেশেই বিপন্ন। স্বাধীনতার পর গত সত্তর বছরে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি ব্রিটিশের আমদানি করা 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' তত্ত্ব প্রয়োগ করে জাতপাত ইত্যাদির নামে হিন্দুদের ক্রমাগত দুর্বল করে চলেছে।

তিনি হিন্দুধর্মের গৌরব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাই তিনি বললেন— "পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সন্ন্যাসী সঙ্ঘের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সব ধর্মের যিনি জননী স্বরূপা অর্থাৎ হিন্দুধর্ম, তার নামে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি কোটি কোটি হিন্দু নর-নারীর পক্ষ থেকে।"

তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন— "আমি সেই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে গৌরব বোধ করি যে ধর্ম জগৎকে শিখিয়েছে পরমত সহিষ্ণুতা ও সর্বজনীন গ্রহিষ্ণুতার আদর্শ"— অর্থাৎ যুগ যুগ ধরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর যে আক্রমণ ও লুণ্ঠন চলেছে (শক, হূন, মোগল, পাঠান) তা আমাদের এই মহান হিন্দুধর্ম বুক পেতে গ্রহণ করেছে। তাদের আপন করে নিয়েছে। কালক্রমে তারাও এই প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গেছে। বিনিময় হয়েছে সংস্কৃতি ও ধর্মের। তিনি আরও বলেছেন— "আমরা শুধু সবধর্মকে সহ্যই করি না, সব ধর্মকে আমরা সত্য বলে মনে করি"— অর্থাৎ আমরা হিন্দুরা বিশ্বাস করি সব ধর্মের গোড়ার কথা এক এবং তা হলো— সর্বশক্তিমানকে লাভ করা, সব ধর্মের গন্তব্যস্থল একই। তিনি আরও বলেছেন— "আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে গর্ববোধ করি (অর্থাৎ হিন্দু জাতি) যে

জাতি পৃথিবীর সব ধর্মের ও সব জাতির নিপীড়িত ও শরণার্থী মানুষকে চিরকাল আশ্রয় দিয়ে এসেছে।" তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন ইহুদিদের একটি অংশ যারা রোমানদের অত্যাচারে দক্ষিণ ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি বুঝিয়েছিলেন জরাথুষ্টের অনুগামী মহান পারসিক জাতির অংশবিশেষকে যারা এই মহান হিন্দুধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন।

তিনি গীতা উদ্ধৃত করে বলেছিলেন— যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন— "হে পার্থ, যে যে-ভাব আশ্রয় করে আসুক না কেন আমি তাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করে থাকি"— অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ যে ধর্মের সিঁড়ি বেয়ে তুমি ওঠো না কেন— সকলের গন্তব্যস্থল একই। অর্থাৎ রামকৃষ্ণদেবের 'যত মত তত পথ' ও গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বাণী যেন মিলে মিশে গেছে— এমনই মহিমা আমাদের এই মহান হিন্দু ধর্মের। বিভিন্ন নদী যেমন সমুদ্রে এসে মেশে ঠিক সেরকমভাবে সব ধর্ম সেই সর্বশক্তিমানের সঙ্গে গিয়ে মেশে।

তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন ধর্মে ধর্মে হানাহানি দেখে। ধর্মীয় মৌলবাদীরা যেভাবে সুন্দর পৃথিবীকে গ্রাস করছিল, মানুষের রক্তে পৃথিবী যেভাবে সিক্ত হচ্ছিল তাতে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাই তার মুখে শোনা যায় "যদি কেউ এরকম স্বপ্ন দেখেন যে, অন্যান্য ধর্ম লোপ পাবে আর তাঁর ধর্ম টিকে থাকবে তবে তিনি বাস্তবিক কৃপার পাত্র,...তাঁর মতো মানুষের বিরোধিতা সত্ত্বেও শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপর লিখিত হবে : বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাব গ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি"— অর্থাৎ এই ধর্মীয় মৌলবাদ কখনই জয়লাভ করতে পারবে না। তিনি প্রত্যেক ধর্মকে অন্য ধর্মাবলম্বীকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার চোখে দেখার কথা বলতেন। তাই বোধহয় তার মুখে শোনা গিয়েছিল— "খ্রিস্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবে না, কিংবা হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রিস্টান হতে হবে না, কিন্তু প্রত্যেকেই অন্য ধর্মের ভাবগুলিকে আত্মস্থ করবে এবং নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী অগ্রসর হবে"। অর্থাৎ নিজ ধর্মের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে অন্য ধর্মের ভাব গ্রহণ করবে। তিনি আরও বলেন— "এই ধর্মমহাসভা জগতে যদি কিছু প্রমাণ করে থাকে তা হলো— এই সাধুতা, পবিত্রতা ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোনও একটি বিশেষ ধর্মের একচেটিয়া সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক ধর্মপদ্ধতির মধ্যেই অতি উন্নত চরিত্রের নরনারী জন্মগ্রহণ করেছেন"— অর্থাৎ সব ধর্মই মহান।

১৫ সেপ্টেম্বর স্বামীজী কূপমণ্ডুক বা কুয়োর ব্যাঙের গল্পটি বলে বুঝিয়ে দিলেন কেন ধর্মে ধর্মে মতভেদ হয়। তিনি বললেন— কুয়োর, ব্যাঙ কুয়োতেই চিরকাল থাকে কুয়োর বাইরে যায়নি। তাই সাগর থেকে এক ব্যাঙ এসে যখন বলল— সাগর কুয়োর তুলনায় অনেক বড়ো তখন সে তাকে মিথ্যাবাদী বলে অপমান করে তাড়িয়ে দিল। এই গল্পটি বলে স্বামীজী বললেন আমরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের ছোট কুয়োর মধ্যে বসে ভাবছি এটাই সম্পূর্ণ জগৎ। তিনি আমেরিকাবাসীকে উদ্দেশ্য করে বললেন— আপনারা যে ছোটো জগতের বেড়া ভাঙার চেষ্টা করেছেন তার জন্য আপনাদের বিশেষ ধন্যবাদ।

ধর্মমহাসভায় তিনি ধর্ম ছাড়াও ভারতের দারিদ্র্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বললেন— 'ভারতে ধর্মের অভাব নেই, অভাব আছে ভাতের'। তিনি আরও বললেন— "আমি আমার দরিদ্র দেশবাসীর জন্য তোমাদের কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিলাম। কিন্তু খ্রিস্টান দেশে খ্রিস্টানদের কাছ থেকে অ-খ্রিস্টানদের জন্য সাহায্য পাওয়া যে কী কঠিন ব্যাপার তা বেশ বুঝতে পারছি"— শ্রোতারা বুঝলেন বিবেকানন্দ শুধু বাগ্মীই নন, হৃদয়বান দেশপ্রেমিকও।

'ভারতে ধর্মের অভাব নেই, অভাব আছে ভাতের'।

স্বামীজীর চিন্তা, বাণী ও আদর্শ আজও সমান প্রাসঙ্গিক। যখন দেখি আই এস জঙ্গিরা 'ইসলাম খতরে মে হ্যায়'— আওয়াজ তুলে বিধর্মীদের হত্যা করছে, কাফেরদের উপর অত্যাচার, উৎপীড়ন করছে তখন বিবেকানন্দকে আরও বেশি করে মনে পড়ে যায়। স্বামীজীর প্রয়াণের পর যখন ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়, ধর্মীয় হানাহানিতে অসংখ্য মানুষের প্রাণ যায়, প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট ধর্মের নামে হাজার হাজার হিন্দুহত্যা হয়, ওই বছরেই কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন ১০ অক্টোবর নোয়াখালিতে অসংখ্য হিন্দুর প্রাণ যায়, কিংবা বর্তমান সময়ে আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ ও পাকিস্তান একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বী বলে অসংখ্য সংখ্যালঘুর অস্তিত্ব বিপন্ন তখন স্বামীজীকে আরও বেশি করে মনে পড়ে। স্বামীজীর আদর্শকে শুধুমাত্র পুঁথিতে ও কয়েকটি অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সমাজ গঠনে ও সর্বোপরি রাষ্ট্র গঠনে সহায়ক করতে হবে। ধর্মে ধর্মে হানাহানি বন্ধের মাধ্যমে রুটি রুজির লড়াই, দেশ গড়ার লড়াই— এই হোক আমাদের আগামী দিনের সংকল্প। আজ হিন্দুরা নিজের দেশেই বিপন্ন। স্বাধীনতার পর গত সত্তর বছরে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি ব্রিটিশের আমদানি করা 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' তত্ত্ব প্রয়োগ করে জাতপাত ইত্যাদির নামে হিন্দুদের ক্রমাগত দুর্বল করে চলেছে। একটি দুর্বল জাতির পক্ষে দেশের সার্বভৌমিকতা রক্ষা করা সম্ভব নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। এই পরিপ্রেক্ষিতেও স্বামীজীর জীবন এবং তাঁর দর্শন আজও প্রাসঙ্গিক। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন শক্তিশালী হিন্দুজাতির। এক সমৃদ্ধ ভারতবর্ষের। আমরা তার সেই স্বপ্নের ভারত গঠনের মাধ্যমে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবো।

(শিকাগো ধর্মমহাসভার ১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

স্বদেশ ভাবনার পথিকৃৎ বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

প্রণব দত্ত মজুমদার

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ যখন ইংরেজের নাগপাশে আবদ্ধ, তখন আমাদের বঙ্গ মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন অসংখ্য মনীষী। জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা, রাজনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের জ্ঞান ও কর্মের বিচ্ছুরণ ভারত তথা বিশ্বকে চমকিত করেছিল। এই সময়টিকে বাংলার নবজাগরণের যুগ বলা হয়। নবজাগরণের যুগে একই বছর ১৮৬১ সালে জন্ম নিয়েছিলেন দুই মহামানব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর প্রফুল্লচন্দ্র রায়। জ্ঞানের শিখরে বিচরণ করলেও দুজনেই ছিলেন দেশমাতৃকার প্রতি আকুল ও নিবেদিত প্রাণ।

বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলার বারুলি গ্রামে ১৮৬১ সালের ২রা আগস্ট প্রফুল্লচন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হরিশ্চন্দ্র রায় যথেষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইংরেজি, আরবি, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। গান বাজনাতেও তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি ভালো বেহালা বাজাতে পারতেন। ওই সময়ের বিখ্যাত ব্যক্তি যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্র রায়ের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন হলে, প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা হরিশ্চন্দ্র নিজের গ্রাম বারুলিতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সেখানকার ছেলেমেয়েদের আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই সময়কালের বিচারে প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা যথেষ্ট আধুনিকমনস্ক ছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই পিতামাতার শিক্ষা ও রুচির প্রভাব শৈশব থেকেই প্রফুল্লচন্দ্রের উপর পড়েছিল।

হরিশ্চন্দ্রের পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে তৃতীয় পুত্র ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। শৈশবে মাতা ভুবনমোহিনী দেবীর কাছেই অক্ষর পরিচয় হয় তাঁর। তারপরে পিতার প্রতিষ্ঠিত গ্রামের স্কুলে পড়াশুনো করেন ১৮৭০ সাল পর্যন্ত। হরিশ্চন্দ্র ছেলেমেয়েদের ভালো করে লেখাপড়া শেখাবেন বলে ১৮৭০ সালে সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন এবং আমহার্স্ট স্ট্রিট অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করেন। ১৮৭১ সালে প্রফুল্লচন্দ্রকে হেয়ার স্কুলে ভর্তি করে দেন। হেয়ার স্কুলে পড়ার সময় মারাত্মক রক্ত-আমাশা রোগে আক্রান্ত হয়ে কিছুকালের জন্য স্কুলের পড়াশোনা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। এই সময় বাড়িতে নিজের চেষ্টায় তিনি লাতিন, ফরাসি, জার্মান ও স্প্যানিশ ভাষা শিক্ষা করেন। পিতার লাইব্রেরির বিপুল পুস্তকরাশি তাঁর জ্ঞান পিপাসা মেটাতে সাহায্য করেছিল। সুস্থ হয়ে ১৮৭৬ সালে আবার তিনি ভর্তি হন অ্যালবার্ট স্কুলে। ১৮৭৯ সালে তিনি ওই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। তারপর বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত 'মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন'-এর কলেজ বিভাগে (এখনকার বিদ্যাসাগর কলেজ) এফ এ-তে ভর্তি হলেন। এফ এ-তে রসায়ন শাস্ত্র ছিল। এই সময় থেকে তিনি প্রায়শই বহিরাগত ছাত্র হিসাবে প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যার উপর অধ্যাপকদের বক্তৃতা শুনতে যেতেন এবং এই ভাবে নিজের অজান্তেই রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ১৮৮১ সালে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এফ এ (ফার্স্ট আর্টস) উত্তীর্ণ হন। এই সময় তিনি একটি পরীক্ষা দিয়ে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গিলখ্রাইস্ট বৃত্তি লাভ করে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য বিলেত যাত্রা করেন এবং ১৮৮২ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএসসি ক্লাসে ভর্তি হন। ১৮৮৫ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বিএসসি পাশ করেন। ১৮৮৭ সালে রসায়ন শাস্ত্রে গবেষণা করে ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিএসসি (ডক্টর অব সাইন্স) উপাধি লাভ করেন। ১৮৮৭ সালে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কেমিক্যাল সোসাইটি'র সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরাধীন

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন। গরিব দুঃখী মানুষ, ছাত্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অকাতরে দান করতেন। অকৃতদার আচার্য রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে ছাত্রদের নিয়ে মগ্ন থাকতেন। শেষ জীবনের সমস্ত অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে দান করেছেন গবেষণার উৎকৃষ্টতাকল্পে 'স্যার পি সি রায় ফেলোশিপ' সৃষ্টি করার জন্য।

দেশের কালোচামড়ার ২৬ বছরের এক তরুণ বিজ্ঞানী তাঁর জ্ঞান ও মেধার জোরে সাদা সাহেবদের সমীহ আদায় করে নিয়েছিলেন। ১৮৮৮ সালের আগস্টে দেশে ফিরে আসেন বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র।

১৮৮৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ রসায়ন বিভাগে অস্থায়ী সহকারী অধ্যাপকের পদে যোগ দেন তিনি। তারপর ২৭ বছর তিনি অধ্যাপনা করেছেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে গভীর গবেষণার কাজেও ডুবে যেতেন তিনি। ১৮৯৫ সালে তিনি আবিষ্কার করেন 'মারকিউরাস নাইট্রাইট'। 'মারকারি' ও 'নাইট্রোজেনের' এরকম আরও কয়েকটি যৌগ তিনি আবিষ্কার করেন। প্রফুল্লচন্দ্রের আগে কোনও বিজ্ঞানী 'মারকারি' ও 'নাইট্রোজেনের' বিক্রিয়া ঘটিয়ে কোনও যৌগ তৈরি করতে পারেননি। সারা পৃথিবীর রসায়ন বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে গেলেন প্রফুল্লচন্দ্রের এই আবিষ্কারে। এই আবিষ্কারের জন্য তিনি লন্ডনের 'রয়েল কেমিক্যাল সোসাইটি'র ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯১৬ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পালিত অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। প্রথমে উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং পরে উপাচার্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তাঁকে এক্সটেনশন দিয়ে ৭৫ বছর বয়স পর্যন্ত ওই পদে রেখে দিয়েছিলেন। অবশ্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এক্সটেনশন পিরিয়ডের জন্য কোনও টাকা পয়সা নেননি; ছাত্রদের মহানন্দে বিদ্যা বিতরণ করে গেছেন। ৭৫ বছর বয়সে পালিত অধ্যাপক পদ থেকে অবসর নেওয়ার পরেও এমেরিটাস অধ্যাপক হিসাবে বিজ্ঞান কলেজে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিরলস ভাবে কাজ করে গেছেন তিনি।

তিনি বিবাহ করেননি। অধ্যাপনা, গবেষণা, সমাজসেবা, বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে স্বদেশি শিল্প স্থাপন, লেখালেখি ইত্যাদি নিয়েই মেতে থাকতেন। ছাত্রদের সঙ্গে তিনি নিবিড় ভাবে মিশতেন। অনেক ছাত্র তাঁর সঙ্গে দিন যাপন করতেন এবং তাঁর গবেষণাগারে গবেষণায় নিমগ্ন থাকতেন। এই জ্ঞান তপস্বীকে দেশবাসী 'আচার্য' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

অধ্যাপনা, গবেষণা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের প্রসার ও উন্নতির জন্য তিনি বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক সংস্থা বা সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য— ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমি ইত্যাদি। ১৯২০ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। মানুষের ভেতরে বিজ্ঞান-চেতনা বাড়াবার জন্য তিনি বহু প্রবন্ধ লেখেন, যেমন— 'নব্য রসায়নী শিক্ষা ও তার প্রয়োগ', 'খাদ্যে ভেজাল নির্ধারণ', 'দেশি রং', 'তেল ও ঘি', 'চা পান না বিষপান' ইত্যাদি। তিনি তাঁর এক ছাত্রের সঙ্গে একত্রে 'খাদ্য বিজ্ঞান' নামে একটি বই লেখেন। লেখেন— ''নব রসায়নবিদ্যা ও তার উৎপত্তি' নামক একটি বই। প্রায় বারো বছর ধরে তথ্য সংগ্রহ করে তিনি দু খণ্ডে ইংরেজিতে লেখেন— A History of Hindu Chemistry নামক এক প্রামাণ্য পুস্তক। জ্ঞানে বিজ্ঞানে হিন্দু সভ্যতা যে কত উন্নত ছিল পৃথিবীর জ্ঞানী মানুষদের সেটাই জানাতে চেয়েছেন তিনি।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস-এর প্রতিষ্ঠা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বিদেশি প্রভুর হাত থেকে মুক্তি পেতে গেলে জাতিকে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে হবে। জ্ঞান অর্জন করলেই হবে না, তাকে কাজে লাগিয়ে স্বদেশী শিল্প গড়ে তুলতে হবে যাতে ব্যবসায়িক লভ্যাংশ বিদেশে চলে না যায় এবং শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইংরেজদের প্রভুত্ব যেন চাপের মুখে পড়ে। এই ভাবনা থেকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র নামমাত্র পুঁজি নিয়ে বাল্যবন্ধু ডাঃ অমূল্য বসুর সঙ্গে মিলে ১৮৯২ সালে নিজের বাসভবনে প্রতিষ্ঠা করলেন— সম্পূর্ণ স্বদেশি শিল্প প্রতিষ্ঠান— বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস। প্রচণ্ড কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমে, নানারকম বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে এটিকে লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত করেছিলেন তিনি। ধীরে ধীরে বড় হলো বেঙ্গল কেমিক্যাল। মানিকতলা ও পানিহাটিতে কারখানা তৈরি হলো। বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর তৈরি জোয়ানের আরক, কালমেঘ, বাসকের সিরাপ, কীটনাশক ফিনাইল ইত্যাদি নানারকম স্বদেশী প্রোডাক্ট ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। বেঙ্গল কেমিক্যাল ছাড়াও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র 'বেঙ্গল ইমিউনিটি' ও বেঙ্গল এনামেল নামে আরও দুটি বড় দেশি রাসায়নিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর আদর্শে মাদ্রাজ, বোম্বাইতে অনুরূপ দেশীয় শিল্প গড়ে উঠল। এদেশের শত শত মানুষের রুজি রোজগারের পথ খুলে গেল। তাঁর এই স্বদেশ ভাবনার ফলে তিনি সেইসময় নিজদেশের বিশেষত তখনকার অবিভক্ত বাংলায় স্বদেশি শিল্প স্থাপনার ক্ষেত্রে মূলপ্রেরণাস্থল হয়ে উঠেছিলেন।

তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকলেও রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও গোখলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে দেশের প্রতি বিদেশি প্রভুদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করে গেছেন। তিনি সবসময়েই দেশের ও সমাজের কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। তিনি সময় পেলেই প্রিয় ছাত্রদের নিয়ে পল্লীগ্রামে চলে যেতেন এবং পল্লী সংস্কারের কাজে গ্রামের যুবকদের উৎসাহিত করতেন। বন্যায় ও দুর্ভিক্ষের কাজে তিনি সবসময় ঝাঁপিয়ে পড়তেন। ১৯২১ সালে খুলনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তিনি দুর্গত মানুষদের সাহায্য করার জন্য কলেজ ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়লেন। তাঁর নেতৃত্বে রিলিফ কমিটি গঠিত হলো। সংবাদপত্রের মাধ্যমে সাহায্যের আবেদন করা হলো; অভূতপূর্ব সাড়া পেলেন। গ্রামে গ্রামে অন্ন, বস্ত্র, অর্থ বিতরণ করলেন। ১৯২২ সালে তখনকার উত্তরবঙ্গের রাজশাহী, বগুরা প্রভৃতি জেলায় ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল, আবার ১৯৩১ সালেও উত্তরবঙ্গে এবং পূর্ববঙ্গে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় লক্ষ লক্ষ মানুষ বন্যার কবলে পড়েছিল। উভয় ক্ষেত্রেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ত্রাণ কমিটির অফিস বানিয়ে, সহযোগীদের নিয়ে বন্যার্তদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। লক্ষ লক্ষ টাকার ওষুধ ও ত্রাণ সামগ্রী বন্যার্তদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যথেষ্ট ধনী পরিবারের সন্তান ছিলেন। নিজেও ছিলেন সরস্বতীর বরপুত্র এবং মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদধন্য, অথচ অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন। গরিব দুঃখী মানুষ, ছাত্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অকাতরে দান করতেন। অকৃতদার আচার্য রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে ছাত্রদের নিয়ে মগ্ন থাকতেন। শেষ জীবনের সমস্ত অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে দান করেছেন গবেষণার উৎকৃষ্টতাকল্পে 'স্যার পি সি রায় ফেলোশিপ' সৃষ্টি করার জন্য। ১৯৪৪ সালের ১৬ জুন ৮৩ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ ভবনে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মহান স্বদেশী বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবনাবসান হয়। ■

রাহুল এবার বরং আপনি অভিযোগ প্রমাণ করতে শিখুন

চন্দ্রভানু ঘোষাল

রাহুল গান্ধী মোদী সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগের পর অভিযোগ করে চলেছেন। কিন্তু কোনওটারই সপক্ষে প্রমাণ দিতে পারছেন না। কয়েক বছর আগে তিনি একটি লাল ডায়েরির কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই ডায়েরির পাতায় পাতায় নাকি সুব্রত রায় সহারার কাছ থেকে উৎকোচ নেওয়া বিজেপির একাধিক নেতা-মন্ত্রীর নাম ছিল। পরে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। রাহুল হয়তো ভেবেছিলেন দশ জনপথের উত্তরাধিকারী হওয়ার সুবাদে আদালত তাকে বাড়তি খাতির করবে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে তাঁকে তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়। বিচারপতি তাকে বলেন, ডায়েরিতে কয়েকজনের নাম টুকে রাখলেই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হয় না। এরপর রাহুল আর কখনও লাল ডায়েরির প্রসঙ্গ তোলেননি।

বস্তুত এই ঘটনার পর সারা দেশে রাহুলের ভাবমূর্তি অত্যন্ত হাস্যকর হয়ে উঠলেও তিনি নিজেকে শোধরাবার কথা ভাবেননি। একের পর এক 'বোমা' ফাটিয়ে গেছেন। যার মধ্যে একটি গান্ধীজীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসের থিংক ট্যাংক হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে অভিযুক্ত করা। এই মন্তব্যের জন্যেও পরে রাহুলকে আদালতে দাঁড়িয়ে নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হয়। এ বছরের গোড়ায় রাহুল গান্ধী আর একটি বোমা ফাটান। অভিযোগ করেন, রাফায়েল বিমান কেনার জন্য মোদী সরকার যে চুক্তি করেছে তাতে অনেক অসংগতি রয়েছে। কী ধরনের অসংগতির কথা বলতে চাইছেন রাহুল? তাঁর অভিযোগ মোদী সরকার বাজারদরের থেকে অনেক বেশি দামে রাফায়েল বিমান কিনছে। কিন্তু ঠিক কত দামে মোদী সরকার বিমান কিনছে বলে রাহুল মনে করেন? এ প্রশ্নের উত্তর রাহুল তিন জায়গায় তিন রকম দিয়েছেন। অর্থাৎ রাফায়েল বিমানের দাম সম্বন্ধে তাঁর সম্যক কোনও ধারণাই নেই। তিনি শুধু অভিযোগই করতে চান। এবং বশংবদ মিডিয়ার সৌজন্যে অসার অভিযোগের ঢাক পিটিয়ে বিভ্রান্ত করতে চান মানুষকে। যাতে দেশের সাধারণ মানুষ নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির প্রতি বিরূপ হয়ে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় নিয়ে আসেন। বস্তুত যে রাজনৈতিক শঠতা এবং মিথ্যাচার তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করেছেন তারই প্রতিফলন ঘটিয়ে চলেছেন নিত্যনতুন পদক্ষেপে।

সম্প্রতি তিনি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। তাঁর অভিযোগ, দেশ ছাড়ার আগের দিন বিজয় মাল্যকে

অরুণ জেটলির সঙ্গে পনেরো-কুড়ি মিনিট কথা বলতে দেখা গেছে। দেখেছেন কংগ্রেসের সাংসদ বি.এস পুনিয়া। সুতরাং রাহুল গান্ধীর মনে তিলমাত্র সন্দেহ নেই, বিজয় মাল্যের পালিয়ে যাবার পিছনে অরুণ জেটলির তো বটেই, নরেন্দ্র মোদীরও হাত রয়েছে। অরুণ জেটলি রাহুলের অভিযোগের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, যে সময়ের কথা রাহুল বলছেন তখন বিজয় মাল্য রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন। বিজয় মাল্যকে রাজ্যসভার মনোনীত সাংসদ করেছিল কংগ্রেস। রাজ্যসভার লবিতে একদিন বিজয় মাল্যের সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যায়। কোনও পূর্বনির্ধারিত সাক্ষাৎকার নয়, স্রেফ দেখা হয়ে যাওয়া। বিজয় মাল্য তখনই ব্যাঙ্কের সঙ্গে ওর ঝামেলার কথা বলতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু অরুণ জেটলি ওকে বলেন যা বলবার ব্যাঙ্ককে গিয়ে বলতে। অরুণ জেটলির এই ব্যাখ্যায় কোনওরকম অস্পষ্টতা বা আড়াল নেই। এরকম হতেই পারে। কিন্তু রাহুল গান্ধী মানতে নারাজ। তিনি এবং তাঁর বশংবদ মিডিয়া সব শেয়ালের এক রা— এই প্রবাদবাক্যটিকে সত্যি প্রমাণ করে চিৎকার করে চলেছেন। এমন ভাব করছেন যেন ওদের এই ঢক্কানিনাদে মোদী সরকার ভয়ানক চাপে পড়ে গেছে। এবং তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন আমরা দেখব ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে। যদিও বাস্তবের ছবিটা অন্যরকম। রাহুল গান্ধীর অবিমৃশ্যকারিতায় সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ, বিরক্ত। দেশের শতাব্দীপ্রাচীন দলটি যাকে ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে তিনি যদি এরকম অপরিণামদর্শী হন তাহলে কিন্তু ২০১৯-এর নির্বাচনে কংগ্রেসের কপালে দুঃখ আছে। কারণ আজকের ভারতীয় জনতা পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে গান্ধীজী এবং জওহরলাল নেহরুর নামে জয়ধ্বনি দেওয়া ব্রিটিশের প্রজা নয়। ওরা স্বাধীন। স্বতন্ত্র বিচারবোধে মানুষ।

তবে হ্যাঁ, রাহুল গান্ধীকে যারা নির্বোধ ভাবছেন তারা কিন্তু ঠিক ভাবছেন না। রাহুল অস্থিরমতি ঠিকই কিন্তু নির্বোধ নন। পাপ্পুও নন। তিনি একটি সহজ কথা জানেন। কথাটি হলো তাঁর নিজের পরিবার এবং দলটিকে বাঁচাতে হলে অন্য কাউকে ফাঁসানো দরকার। তিনি বিলক্ষণ জানেন কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ মদত ছাড়া বিজয় মাল্যের পক্ষে সাধারণ মদ প্রস্তুতকারক থেকে লিকারব্যারন হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না।

সম্প্রতি রিপাবলিক টিভির অর্ণব গোস্বামী দুটি চিঠির কথা জানিয়েছেন। চিঠি দুটির লেখক বিজয় মাল্য এবং প্রাপক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। ২০১১ সালের অক্টোবরে লেখা চিঠিতে বিজয় মাল্য ওকে সময় দেওয়ার জন্য এবং সাহায্য করার জন্য মনমোহন সিংহকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'সেপ্টেম্বরের আট তারিখে আমাকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।' সাক্ষাৎকারের তারিখটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ওই সময়ে বিজয় মাল্যের ঋণের পরিমাণ ছিল ৬ হাজার কোটি টাকা। সাক্ষাৎকারের আবেদন জানিয়ে বিজয় মাল্য যে চিঠি লিখেছিলেন তা থেকে জানা যাচ্ছে, ব্যাঙ্ক থেকে এত ঋণ করার পরেও কিংফিশারের আর্থিক দুরবস্থা কাটেনি। এর কারণ হিসেবে তিনি দুটি কারণকে দায়ী করেন। তেলের চড়া দাম এবং ২৫ শতাংশ হারে বিক্রয়কর। তিনি লিখেছিলেন, 'আমরা বিষয়টি কনসর্টিয়াম অব ব্যাঙ্কস কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। এই কনসর্টিয়াম স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার অধীন। দুরবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য এখনই আমাদের অর্থসাহায্য প্রয়োজন। সেই অর্থ ওয়ার্কি; ক্যাপিটাল বা স্বল্পমেয়াদি ঋণ হিসেবে আমাদের দেওয়া যেতে পারে।'

এরপর আমাদের চলে আসতে হবে ২০১৭-র ৬ অক্টোবরে। এই দিন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এসএফআইও (সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিস)-র একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তাতে দেখা যাচ্ছে প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে বিজয় মাল্যের কিংফিশার এয়ারলাইন্স ভাড়া নিত না। কিংফিশারের বিপণন বিভাগের সদস্য বিজয় অরোরাও একথা স্বীকার করেন। প্রশ্ন ওঠে, গান্ধী পরিবারের প্রতি বিজয় মাল্যের এই বদান্যতার কারণ কী? অভিযোগ, সোনিয়া গান্ধীর সার্টিফিকেট পাবার পর মূলত এই সময় থেকেই বিজয় মাল্যকে 'বাঁচানো'র কাজ শুরু হয়। এবং বিজয় মাল্যের 'ধন্যবাদ জ্ঞাপক' চিঠি প্রমাণ করে এ ব্যাপারে মনমোহন সিংহ নিজেই সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা কীভাবে?

বিজয় মাল্যের হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য মন্ত্রকের সঙ্গে সমন্বয় গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছিল খোদ প্রধানমন্ত্রীর অফিস। উদ্দেশ্য ডুবতে বসা কিংফিশারকে অক্সিজেন দিয়ে টিকিয়ে রাখা। সেই সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এবং যেসব ব্যাঙ্কে বিজয় মাল্যের অ্যাকাউন্ট রয়েছে, তাদের মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে আলোচনা শুরু হয়। ইউপিএ গভর্নমেন্টের শেষ তিন বছরের কাজকর্ম সম্বন্ধে যারা খোঁজখবর রাখেন তারা জানেন, এই সময়েই বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়ার শর্তাবলী সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছিল। উদ্দেশ্য ঋণখেলাপিররাও যাতে আরও ঋণ পান সেই ব্যবস্থা করা। প্রশ্ন উঠবে, এই সংস্কার শুধু বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রেই বা কেন? কারণ বিজয় মাল্য বিমান পরিবহণ সংস্থার মালিক, তাই। সেই সময় স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া যেসব বিশেষ সুবিধে বিজয় মাল্যকে পাইয়ে দিয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য আর বি আইয়ের কাছে আছে। ২০১২ সালে এস বি আই রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে একটি চিঠি লিখেছিল। বিজয় মাল্য তাঁর ধন্যবাদ জ্ঞাপক চিঠিতে ঠিক যেরকম বদল বিদেশি বিনিয়োগ নীতিতে চেয়েছিলেন, মনমোহন সিংহের সরকার যে অনেকটা সেই ঢঙেই নীতি নির্ধারণ করতে চলেছেন সেটা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের নজর এড়ায়নি। তাই ২০১২ সালে, 'আরও ঋণ চাই'— বিজয় মাল্যের এই বায়নায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ণপাত করেনি। তবে তাই নিয়ে বিতর্কও কিছু কম হয়নি।

সুতরাং নিশ্চয় বুঝতে পারা যাচ্ছে, মোদী সরকারের বিরুদ্ধে বা অরুণ জেটলির বিরুদ্ধে রাহুলের বিষোদ্গার আসলে তার নিজের পরিবার এবং দলকে বাঁচানোর জন্য। সিবিআই তদন্তে ইতিমধ্যেই অনেক তথ্য উঠে এসেছে। ক্রমশ মানুষ বুঝতে পারছেন এদেশের সামাজিক দুর্বৃত্তায়নের মূল কারিগর কংগ্রেস নামের শতাব্দী প্রাচীন দলটি। কংগ্রেসের জমানায় বিজয় মাল্যরা শাঁসেজলে বাড়েন আর নরেন্দ্র মোদীর জমানায় ভয় পেয়ে বিদেশে পালান। রাহুল গান্ধীকে বুঝতে হবে যারা পালিয়ে যেতে সাহায্য করে তারা ফিরিয়ে আনার জন্য যুদ্ধ করে না। মোদী সরকারের অনুৎপাদক সম্পদ সংক্রান্ত নীতি জানার পরেই বিজয় মাল্য বুঝতে পেরেছিলেন এদেশ আর তার জন্য নিরাপদ নয়। তাই, যঃ পলায়তি সঃ জীবতি! আর হ্যাঁ, রাহুল গান্ধীকে আরও একটা কথা বুঝতে হবে। রাজা হোন বা কংগ্রেসি রাজপুত্র, শিশুপালদের একশো বারের বেশি ক্ষমা করার রীতি ভারতীয় পরম্পরায় নেই। তাই বারবার মিথ্যে কথা বলে ধরা পড়ে গেলে রাহুল শুধু নির্বাচনেই হারবেন না, ওর রাজনৈতিক অস্তিত্বও লুপ্ত হবে চিরতরে। ■

রাহুল গান্ধীকে একটা কথা বুঝতে হবে। রাজা হোন বা কংগ্রেসি রাজপুত্র, শিশুপালদের একশো বারের বেশি ক্ষমা করার রীতি ভারতীয় পরম্পরায় নেই। তাই বারবার মিথ্যে কথা বলে ধরা পড়ে গেলে রাহুল শুধু নির্বাচনেই হারবেন না, ওর রাজনৈতিক অস্তিত্বও লুপ্ত হবে চিরতরে।

আমি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত

অসমের মতো এই পশ্চিমবঙ্গের মালদা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, দুই চব্বিশ পরগনা, কোচবিহার, হাওড়া, হুগলি, নদীয়া এবং কলকাতার জনসংখ্যার আধিক্যে মুসলমানরা এগিয়ে চলেছে দ্রুত। কিছু জেলায় তারাই সংখ্যাগুরু। সেখানে তাদের রাজনীতিই চলছে। আর যেগুলিতে তারা ৩০ শতাংশ থেকে ৩৫-৪০ শতাংশ রয়েছে, দুই দশকের মধ্যেই সমান অথবা সংখ্যাগুরু শ্রেণীতে পরিণত হবে। এর পরবর্তী রাজনীতি কীরকম হবে তা সহজেই অনুমেয়। আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক ভোট ভিক্ষুকরা এই সমীকরণ অনুধ্যান করতে অপারগ। ভোটের নামে তাদের পায়েই গড়াগড়ি দিচ্ছে তারা।

আমি কোনও ঘৃণা বা দ্বেষ থেকে নয়, যথেষ্ট অনুশীলন করেই একথাগুলি জানালাম। আমি কৃষ্ণ, বুদ্ধ, জালাউদ্দিন রুমি, নিজামুদ্দিন আউলিয়া, চিস্তি কবীর, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথকে মানি। বাঙ্গালি একটি আত্মবিস্মৃত জাতি। নিজের ইতিহাস রচনায় তারা অনিচ্ছুক। সবচেয়ে আক্ষেপের বিষয় হলো, দেশ ভাগের মতো ট্রাজিক ঘটনার জন্য যে রাজনৈতিক দলটি দায়ী তাদের এখনো অর্চনা চলেছে। যে পরিবারটি সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষকে শোষণ করেছে, এখনো প্রতিদিন কর্পোরেট মিডিয়া সেই সিজোফ্রেনিক ব্যক্তিকে প্রথম পাতায় ছবি দিয়ে ছাপছে। আমাদের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলি ভূতের নৃত্যে শামিল। তারা দেখেও দেখছে না। এক বিশেষ সম্প্রদায় রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালিয়ে দেশটাকে আবার ভাগ করতে চাইছে।

আমি অত্যন্ত সাংস্কৃতিক মনস্ক হওয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট আতঙ্কিত। বিগত ছয় দশক ধরে যে ধ্বংসাত্মক রাজনীতির চর্চা শুরু হয়েছে তা আজও অব্যাহত। কোনও ধর্ম নয়, বর্ণ নয়, বিজ্ঞান ও সৃষ্টিশীল সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে দিয়ে নতুন বাংলা গড়ে উঠুক। কোনও মনোলিথিক সংস্কৃতি নয়।

আমার বোধের সঙ্গে কিছু ফারাক হতেই পারে, তবে সেই ফারাককে মেনে নিয়েও যদি আমরা এগোতে পারি আমাদের কর্মভূমি বঙ্গভূমি তথা ভারতবর্ষের জন্য। না হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না। শপিং মল সংস্কৃতি, ফেসবুক সংস্কৃতিতেই আবদ্ধ না থেকে পার্ফমিং আর্ট আর ফলিত বিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করতে হবে।

ঘৃণা দিয়ে নয়, বিদ্বেষ দিয়ে নয়, এক নয়া সাংস্কৃতিক জোয়ার আনতে হবে। শ্রীচৈতন্য, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ রবীন্দ্রনাথ, লালন ফকির, কাঙাল হরিনাথ, বিষ্ণুপুর সংগীত ঘরানা, আলাউদ্দিন খাঁর সঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জগদীশচন্দ্র বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত, আশুতোষ মুখার্জি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ প্রত্যেককেই স্থান দিতে হবে নতুন বঙ্গ গড়ায়। সেখানে থাকবে না কোনও তোষণের স্থান।

—শ্রীমান চক্রবর্তী,
হালতু, কলকাতা।

ডাক-কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা

সম্প্রতি সাড়ম্বরে, 'ভারতীয় ডাক পেমেন্ট ব্যাঙ্ক'-এর উদ্বোধন হলো। সরকারি ঘোষণায় জানা গেল দেড় লক্ষ ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলিও এই নেটওয়ার্কে যুক্ত হবে। এও জানা গেল যে, বর্তমানে প্রায় তিন লক্ষ ডাক-কর্মী আছেন। অর্থাৎ ডাকঘর পিছু দুজন কর্মী। কার্যত, উপ-ডাকঘরগুলিতে একজন কর্মী দেখা যায়। এই একজন কর্মী ডাকঘরের সমস্ত রকম কাজ সামলাতে হিম্‌শিম্‌ খান। ডাক-এজেন্টদের মাধ্যমে এন এস সি, কিষাণ বিকাশ পত্র ইত্যাদি কিনতে গেলে জানা যায় কর্মীর অভাবে রোজ এজেন্টদের সবরকম কাজ হয়ে ওঠে না। অথচ রেডিয়ো, টিভিতে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন ডাক-কর্তৃপক্ষ, 'ডাকঘর বাড়ির পাশে, টাকা জমান মাসে মাসে।' স্বল্প আলো, অপরিসর জায়গা, কম কর্মী ইত্যাদি কারণে বয়স্ক গ্রাহকরা সমস্যায় জর্জরিত

হচ্ছেন। কম ডাক-সেবক থাকায় সবজায়গায় সবদিন চিঠি বিলি হচ্ছে না। যত উন্নত প্রযুক্তির আশ্রয় নেওয়া হোক না কেন, কর্মীর অভাবে পরিষেবা তলানিতে পৌঁছে গেছে। অন্তত দুজন কর্মী উপ-ডাকঘরগুলিতে রাখার ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় ডাকসেবক নিয়োগ করলে আমাদের মতো গ্রাহকরা উপকৃত হবে।

—ভোলানাথ নন্দী,
মানিকপুর, মেদিনীপুর।

বাংলাদেশে হিন্দুদের আহ্লাদিত হওয়ার কিছু নেই

বাংলাদেশে ডিসেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আশার কথা, এবারের নির্বাচনে প্রচুর হিন্দু প্রার্থী অংশ নিচ্ছে। শেখ হাসিনার দল এবং বিএনপি দল উভয়েই হিন্দু প্রার্থী মনোনীত করেছে। ২০১৪ সালের নির্বাচনে হিন্দু প্রার্থী ছিলেন মাত্র ১৮ জন, এবারে জাতীয় পার্টির হয়ে প্রায় ১০ জন, নির্দলের হয়ে ৪ থেকে ১০ জন ভোটে লড়বেন। বাংলাদেশ সংখ্যালঘু ফেডারেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে সিলেটের ১ আসনে দিবা রানিকে প্রার্থী ঘোষণার মাধ্যমে হিন্দু প্রার্থী মনোনয়ন শুরু হবে। আওয়ামি লিগের একটি সূত্র জানিয়েছে হিন্দু সাংসদের বেশিরভাগের বিরুদ্ধে বহু দুর্নীতির অভিযোগ জমা পড়েছে, ফলে তারা অনেকেই মনোনয়ন পাবেন না। তবে আওয়ামি লিগ এবারের নির্বাচনে তরুণ মুখ আনার জন্য চেষ্টা করছে। বাস্তবে সেই চিন্তাধারা ঠিক থাকবে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কারণ তরুণ প্রজন্মের বেশির ভাগ ছেলেদের কাউকে খুন করা হয়েছে, কেউ ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছে,

কেউ আবার ওখান থেকেই ভয়ে সেঁটিয়ে রয়েছে। কারণ ওখানকার হিন্দুদের তো নিরাপত্তাই নেই, ভোটে লড়া তো দূরের কথা, বেঁচে থাকাই দায় হয়েছে। ওখানকার পরিস্থিতি বর্তমানে যা দাঁড়িয়েছে সেটা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় কারো যদি তিনটে ছেলে দুটো মেয়ে থাকে তবে একটা রেখে বাকিগুলো নিরাপত্তার খাতিরে ভারতে না পাঠিয়ে আর উপায় কি? পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি এলাকায় আই এস জঙ্গির হুমকির চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়, হয় ইসলাম গ্রহণ কর নয় মরো। সেই ৭১২ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের হাজ্জাজ বিন ইউসুফ-এর সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু অভিযানের সময় যেমন করেছিল এখন বর্তমান বাংলাদেশে অতটা না হলেও কম কিছু হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। তাছাড়া বর্তমান এন আর সি-র ভয় কিছুটা হলেও বাংলাদেশকে কাবু করেছে, যদি না অসমের চাপ কিছুটা পড়ে। তবে নির্বাচনে কিছু হিন্দু মনোনীত হলেও হিন্দুদের আহ্লাদিত হওয়ার কিছু নেই।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর, নদীয়া।

পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ

ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী দাবি তুলেছেন আগামী লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের ৪২টি আসনের মধ্যে ১৮টি আসনে প্রত্যেক দলকেই মুসলমান প্রার্থীর জন্য ছেড়ে দিতে হবে। কারণ, মুসলমানরা সংখ্যায় ৩৫ শতাংশ। বিষয়টি মহম্মদ আলি জিন্নাহ-র দ্বিজাতিতত্ত্বের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। বিধানসভা নির্বাচনেও অনুরূপ দাবি ত্বহা সাহেবের কাছ থেকে আসতেই পারে। তেমনই হয়তো ত্বহা সাহেব আশা করছেন তিনিই পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী। এতে আর আশ্চর্য কী! আশঙ্কা হয়, তবে কী পশ্চিমবঙ্গ ভঙ্গ হবে? পশ্চিমবাংলাদেশ হবে? না প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে?

পশ্চিমবঙ্গ আজ বিপন্ন, হিন্দুরা বিপন্ন। পরিকল্পিত সামাজিক- রাজনৈতিক-ধর্মীয় আক্রমণ, অনুপ্রবেশ, আতঙ্কবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির তাণ্ডবলীলা, বাক্-স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছচার, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থন, ধর্মান্তরকরণ, হত্যা, লুঠ, ধর্ষণ, শিশুপাচার, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি সমানে চলছে। আমরা সংযমী, কিন্তু অশুভশক্তির আপচেষ্টাকে ব্যর্থ করাটা আমাদের কর্তব্য। আমরা যেন বিশুদ্ধ চরিত্রের অধিকারী হই। বীরত্ব ও সংগঠিত কার্যশক্তির দ্বারা আমরা যেন আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করতে পারি এবং পশ্চিমবঙ্গকে বাসোপযোগ্য করতে পারি।

—ড. প্রকাশচন্দ্র চক্রবর্তী,
সভাপতি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, উত্তরবঙ্গ প্রদেশ।

স্বচ্ছতার পরীক্ষায় ডাহা ফেল এরাজ্য

পশ্চিমবঙ্গের 'মা-মাটি-মানুষ'-এর সরকার যতই উন্নয়নের জয়ঢাক পেটাক না কেন, তা যে নেহাতই রাজ্যবাসীকে ফাঁকি দেওয়ার এক আশ্চর্য ফন্দি, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের নগর ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে, দেশের সবচেয়ে অপরিচ্ছন্ন ২৫টি শহরের মধ্যে এ রাজ্যেরই রয়েছে ১৯টি শহর, যার মধ্যে ৭টিই পুরসভা। তাছাড়া ওই সমীক্ষায় যে ১০টি স্বচ্ছ শহরের নাম উঠে এসেছে তাদের মধ্যে এ রাজ্যের কোনও শহরের নাম নেই। অর্থাৎ সারাদেশের স্বচ্ছতার নিরিখে এ রাজ্য ডাহা ফেল। আর এটা এ রাজ্যের লজ্জা নয় কি? নয় কি সরকারের লজ্জা? যদি লজ্জা বলে কিছু থাকে।

'স্বচ্ছ ভারত' বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে যেভাবে স্বচ্ছতা আনতে পেরেছে পশ্চিমবঙ্গ তাদের ধারে কাছেও নেই। বরং তার ঠাঁই হয়েছে সবার পেছনে। তার প্রমাণ হচ্ছে, ৫০০টি শহরে চালানো স্বচ্ছতার পরীক্ষায় শীর্ষস্থান দখল করেছে বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর। আবার ২য় ও ৩য় স্থানেও রয়েছে যথাক্রমে ভোপাল ও চণ্ডীগড়— দুটিই বিজেপি শাসিত। ভোপাল মধ্যপ্রদেশ ও চণ্ডীগড় কেন্দ্র শাসিত চণ্ডীগড়ের অন্তর্গত। এ ছাড়াও বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্রের নবি মুম্বই ও পুণে শহরও রয়েছে প্রথম দশে। সেই বিচারে প্রথম ১০টি স্বচ্ছ শহরের মধ্যে ৫টিই বিজেপি শাসিত রাজ্যে। আর এ থেকে প্রমাণিত, 'স্বচ্ছ ভারত' বহু রাজ্যেই স্বচ্ছতা আনতে পেরেছে।

কেন্দ্রের 'স্বচ্ছ ভারত'-এর নামান্তর ঘটিয়ে যতই 'নির্মল বাংলা' করা হোক না কেন, বাংলা নির্মল হয়নি। অস্বচ্ছই রয়ে গেছে। সত্যি বলতে কী, কেন্দ্রের বিরোধিতা করে কোনও রাজ্য কখনও উন্নয়ন ঘটাতে পারে না। অতীতে কেউ পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না। বামজমানার ৩৪ বছরে রাজ্যের উন্নয়ন পড়েছিল মুখ থুবড়ে। অতঃপর ৭ বছরের তৃণমূলী রাজত্বে উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। বাম সরকার রাজ্য চালাতে ঋণ করেছিল প্রায় দু' লক্ষ কোটি টাকা। ভোগবাদী দার্শনিক চার্বাক ঋণ করে ঘি খেতে বলেছেন (ঋণং কৃত্বাঃ ঘৃতং পীবেৎ)। কিন্তু ঋণ করে ঘি খাওয়া সম্ভব হলেও, ঋণের টাকায় আর যাই হোক রাজ্যের বা দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। কারণ ঋণ করলে ঋণ শোধের দায়িত্ব থাকে। তাই এখন ঋণগ্রস্ত 'মা-মানুষ'হীন 'মাটি' সরকারের ব্যয় সংকোচনের পথে হেঁটে লাভ কী? সর্বনাশ যা হওয়ার তা এতদিনে হয়েই গিয়েছে। তাই ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে মুক্তির চেষ্টা বৃথা। সরকারের মৃত্যু-ঘণ্টা বাজা এখন সময়ের অপেক্ষা। তবে এই সরকার শুধু স্বচ্ছতায়ই ফেল করেনি, ফেল করেছে আরও অনেক উন্নয়ন প্রকল্পে। অথচ প্রচার চলছে— 'মা-মাটি-মানুষ'-এর সরকার নাকি এরাজ্যে বইয়ে দিয়েছে 'উন্নয়নের বন্যা'!

—ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

ঠাকুরবাড়ির প্রতিভাসুন্দরী দেবীর কর্মময় জীবন বর্তমান নারী সমাজকে অনুপ্রেরিত করে

অঙ্গনা

মালিনী চট্টোপাধ্যায়

প্রতিভাসুন্দরী দেবী (১৮৬৫–১৯২২) রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম সন্তান ও জ্যেষ্ঠাকন্যা। প্রতিভাদেবীর মায়ের নাম নীপময়ী দেবী। ঠাকুরবাড়ির কন্যাদের মধ্যে তিনিই প্রথম নানা বিদ্যায় পারদর্শিনী হয়ে সে যুগের বিদ্বজ্জনেদের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হন।

১৮৭১-এর এপ্রিল মাসে প্রতিভাদেবী বেথুন স্কুলে ভর্তি হন। এসময় গৃহশিক্ষক অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তিনি অধ্যয়ন করতেন। সরলা দেবী চৌধুরানী তাঁর 'জীবনের ঝরাপাতা'য় দাসী ও গৃহশিক্ষকদের কঠোর অনুশাসনে নিজের প্রতিপালিতা হওয়া প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেছেন, 'এ-বাড়ির আর এক ঘরেও ছেলে-মেয়েরা কড়া শাসনে পালিতা হয়েছেন। সে কিন্তু তাদের স্বয়ং বাপ-মায়ের— ঝি মাস্টারের নয়, সেজমামা হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভাদেবী ও তার ভাই-বোনেরা পড়াশুনা ও সংগীত অভ্যাসের নিয়মনিগড়ে একেবারে বদ্ধ থাকতেন। নিয়ম থেকে বিচ্যুত হলে সেজমামার হাতে উত্তমমধ্যম খেতেন। বাড়ির অন্য ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার তাদের সময় হতো না। জীবনের প্রথম দিকটায় প্রবৃত্তিও ছিল না, তাদের মহলের কবাট কী ভিতরের, কী বাইরের অর্গলবদ্ধই থাকত, অবাধ গতিবিধি ছিল না কারো। যত বড় হতে লাগলেন, এক একরকমের কবাট খুলতে লাগল।"

হেমেন্দ্রনাথের কঠোর শাসনে বাল্যকাল থেকেই প্রতিভাদেবী সংগীত বিদ্যায় পারদর্শিনী হয়ে ওঠেন। ১৮৭৮-এর ১৮ ফেব্রুয়ারি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি প্রকাশিত হয়— "Saturday 16th February... There were two interesting Social gatherings this evening,...the other conversation at Babu Debendrarath Tagore's to which his son Babu Dwijendranath Tagore invited native authors and Scholars. Both the reunions went off very well. At last a little cherub in the person of a grand daughter of Babu Debendranath Tagore, a sweet little girl of about ten or eleven years, discoursed angelic music. The amiable host was very attentive to his guests." এই কিন্নরীটি বালিকা প্রতিভাদেবী।

১৮৭৯-এ প্রতিভাদেবী বেথুন স্কুল ছেড়ে ভর্তি হন লরেটো হাউসে। লরেটোতে প্রতিভাদেবীই প্রথম হিন্দু (ব্রাহ্ম) ছাত্রী ছিলেন। সেসময় মেয়েদের ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। তবে প্রতিভাদেবী পরীক্ষা না দিলেও উচ্চশ্রেণী পর্যন্ত উঠেছিলেন।

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিদ্বজ্জন সমাগম হয়। এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকে প্রতিভাদেবী সরস্বতীর ভূমিকায় অভিনব করেন। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, ''আমি বাল্মীকি সাজিয়াছিলাম এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা সরস্বতী সাজিয়াছিল— বাল্মীকি প্রতিভা নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়া গিয়াছে।" ২৭ ফেব্রুয়ারি সাধারণী সাপ্তাহিকে অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে লেখা হয়, ''কল্য শনিবার সন্ধ্যার পর কলকাতার জোড়াসাঁকোস্থ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, বাবু শীতলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাজা শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ডাক্তার কানাইলাল দে, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন প্রমুখ বহুতর আহূত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।... 'বাল্মীকি প্রতিভা' নামে একখানি অভিনব গীতিকাব্য অভিনীত হয়। বাল্মীকি সরস্বতী কৃপায় দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কিরূপে অমর কবিত্ব লাভ করেন তাহা প্রদর্শন করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং বাল্মীকি হন আর 'প্রতিভা' নাম্নী প্রতিভাসম্পন্না তাহার দ্বাদশবর্ষীয়া ভ্রাতুষ্কন্যা বাগ্‌দেবী রূপে অভিনয় করেন। বঙ্গকুল-কুমারী কর্তৃক রঙ্গ-বেদী এই প্রথম উজ্জ্বলীকৃত হইল। বঙ্গ রঙ্গ-ভূমির নবকলেবরের এই অভিষেক ক্রিয়ার প্রতিভা উপযুক্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবী বটেন, তিনি সুকণ্ঠা, গীতিনিপুণা, সতেজ নয়না এবং ধীরপদ বিক্ষেপ-কারিণী, তাঁহার গীতাভিনয়ে দর্শকবৃন্দের অনেকে বিস্মিত এবং প্রীত হইয়াছিলেন।"

১৮৮৫-র 'বালক' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় প্রতিভাদেবী রবীন্দ্রনাথের 'বল গোলাপ মোরে বল' গানটির স্বরলিপি প্রকাশ করেন। এইটিই রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম মুদ্রিত স্বরলিপি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গানের প্রথম স্তবকটির স্বরলিপিও তিনি প্রকাশ করেন।

১৮৮৬ সালের ১৪ আগস্ট ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে প্রতিভাদেবীর পরিণয় ঘটে। কিছুকাল পরে তাদের প্রথম পুত্র আর্যকুমারের জন্ম হয়।

পরবর্তীকালে প্রতিভাদেবী মহিলা ও শিশুদের জন্য 'সংগীতসঙ্ঘ' নাম দিয়ে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথের গানকে ঠাকুরবাড়ি ও শান্তিনিকেতনের গণ্ডীর বাইরে বৃহত্তর বাঙ্গালি সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছিল এই সঙ্ঘ। ১৯২১-এর ২১ আগস্ট এই সঙ্ঘের তরফে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানানো হলে তিনি ভাষণে বলেন, 'লক্ষ্মী ও সরস্বতীর যুগলপদ্ম যেন সংগীত সঙ্ঘের সাধনায় প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।'

আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে জন্মগ্রহণ করা এই নারীর কর্মময় জীবন আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়। ■

পান-সুপারিও ক্যান্সার সৃষ্টি করে

ডাঃ পার্থ সারথী মল্লিক

প্রথমে জেনে নেওয়া যাক পান-সুপারি বা জর্দার রসায়ন এবং এর ক্ষতিকারক দিকগুলো। পানে রয়েছে কিছু টারফেনলস। পান খাওয়ার কারণে ঠোঁট ও জিহ্বায় দাগ পড়ে যায়। দাঁতে প্রায় স্থায়ী দাগ পড়ে যায়। অনেকেই ভেবে থাকেন জর্দা বা তামাক পাতা ছাড়া শুধু সুপারি দিয়ে পান খেলে তেমন কোনও ক্ষতি হয় না। সবার জানা প্রয়োজন— তাইওয়ানের অধিকাংশ মানুষ টোব্যাকো সামগ্রী ছাড়া সুপারি দিয়ে পান খেয়ে থাকেন। তাইওয়ানের এক গবেষণায় দেখা গেছে সুপারি নিজে ক্যান্সার সৃষ্টি করে থাকে। সুপারিতে রয়েছে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদান ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড। চুনে রয়েছে প্যারাঅ্যালোনফেনল, যা মুখে আলসার সৃষ্টি করে, এই আলসার ধীরে ধীরে ক্যান্সারে রূপান্তরিত হয়। সুপারি চুনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে এরিকোলিন নামের একটি নারকোটিক

এলকালয়েড উৎপন্ন করে। আবার অনেকের মতে, সুপারিতে এমনিতেই এরোকোলিন এনকালয়েডজ থাকে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই পদার্থটি স্নায়ুতন্ত্রে উত্তেজনা সৃষ্টি করে, যার কারণে চোখের মণি সংকুচিত হয় এবং মুখে লালার নিঃসরণ বেড়ে যায়। শুধু তাই নয়, চোখে জল পর্যন্ত আসতে পারে। তবে এক খিলি পান-সুপারিতে এসব পরিবর্তন দেখা নাও যেতে পারে। কাঁচা সুপারি উত্তেজক হিসাবে কাজ করে। সুপারিতে রয়েছে উচ্চমাত্রায় সাইকোঅ্যাক্টিভ এলকালয়েড। এই কারণে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কাঁচা সুপারি চিবালে শরীর গরম হয়, এমনকী গা ঘামতে থাকে। সুপারিতে রয়েছে এরিকেন ও এরকোলিন যা উত্তেজনার দিক থেকে নিকোটিনের সঙ্গে তুলনীয়। অন্য এলকালেয়েডগুলোর মধ্যে রয়েছে এরিকাইডিন, এরিকোলিডিন, গুরাসিন বা গুয়াসিন গুবাকোলিন ইত্যাদি। সুপারি খেলে তাৎক্ষণিক যেসব সমস্যা দেখা দেয় তাহলো— অ্যাজমা বেড়ে যেতে পারে, রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে, নাড়ির স্পন্দনের মাত্রা বেড়ে গিয়ে অস্থিরতার অনুভব হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি সুপারি খেলে সাবমিউকাস ফাইব্রোসিস হতে পারে যা ক্যান্সারের পূর্বাবস্থা। মূলত আমাদের দেশে মুখের ক্যান্সারের মধ্যে স্কোয়ামাস সেল কারসিনোমা বেশি দেখা যায়। আমাদের দেশে পানের সঙ্গে সাদা পাতা বা জর্দা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। জর্দা পছন্দ মতো না হলে অনেকের আবার অভিমান হয়। কিন্তু পানের সঙ্গে যারা তামাক জাতীয় দ্রব্য নিয়ে থাকেন তাদের সাধারণের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি ওরাল ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই জর্দা যত সুগন্ধীই হোক না কেন তা ধীরে ধীরে জীবনের গন্ধটাকেই বিলীন করে দেয়। পানের সঙ্গে যে খয়ের খাওয়া হয়, তা মুহূর্তের মধ্যে মুখ লাল করে দেয়। খয়ের তৈরি হয় অ্যাকসিয়া ক্যাটুতে নামক গাছের কাঠ থেকে। খয়ের অ্যাসট্রিনজেন হিসাবে কাজ করে মুখের ভেতরের নিউকাস মেমব্রেন সঙ্কুচিত করে দেয়। অনেকেই বিচিত্র পদ্ধতিতে পান সেবন করে থাকেন। কেউ কেউ পানের রসের সঙ্গে ছোবড়াও খেয়ে ফেলেন। কেউ আবার পানের কিছু অংশ মুখের মধ্যে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। এক্ষেত্রে মুখে আলসার বা ক্যান্সার দেখা দেয়। অনেকে আবার পানের নেশা থেকে বাঁচতে প্যাকেটজাত পানমশলা কিনে চিবোতে থাকেন। পানমশলার সঙ্গে মেনথেল মিশিয়ে মুখের ভেতরে ঠাণ্ডা অনুভব আনা হয়। সবই কিন্তু শরীরের জন্য ক্ষতিকারক। তাই আপনিই পারেন নিজেকে নেশা মুক্ত করে সুন্দর জীবন উপভোগ করতে, সমাজকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে। ■

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

‘দাদাভাই গোপবন্ধু তিলকো গান্ধিরাদৃতাঃ।’ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একাত্মতাস্তোত্রমে ঠিক এভাবেই বন্দনা করা হয়েছে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে। ভারতের আর কোনো রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক সংগঠন, এমনকী গান্ধীর সন্তানসম কংগ্রেসও, ঠিক এইভাবে গান্ধী বন্দনা করেনি কখনো। তবু, ১৯৪৮ সালে গান্ধী হত্যার পরবর্তী সময় থেকে বারবার আর এস এস-কেই কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে। নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গান্ধী হত্যার সঙ্গে আর এস এস-এর নাম জড়িয়ে মিথ্যা প্রচার হয়েছে। এখনো হচ্ছে। মিথ্যা অভিযোগে ১৯৪৮ সালে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার আর

REGD. NO. M. 2776. MORNING.

The Indian Express

VOL. XVI. NO. 91. MADRAS: THURSDAY, FEBRUARY 5, 1948. 8 PAGES: 1½ ANNAS.

ARYA VAIDYA PHARMACY
Head Office: :: COIMBATORE :: Phone No. 268.
MADRAS BRANCHES:
149, Lloyds Road, ROYAPETTAH. Phone No. 84118. | 62, Usman Road, Mambalam Bus Terminus, T'NAGAR.
Arya Vaidyan P. V. RAMA VARIER will be available for consultation at MADRAS
(Royapettah Branch) on 2nd & 4th Sunday of every month.

www.truthofgujarat.com TruthOfGujarat TruthOfGujarat

KEN TO PROTECT

HIS LIFE WAS FAR FROM A BED OF ROSES

R. S. S. Declared Unlawful Throughout India

MOVE FOR ROOTING OUT FORCES OF HATE & VIOLENCE

Govt. Communique Issued

NEW DELHI, Feb. 4.

THE R. S. S. HAS BEEN DECLARED AN UNLAWFUL ORGANISATION THROUGHOUT THE INDIAN DOMINION, IT IS OFFICIALLY ANNOUNCED.

A communique issued by the Ministry of Home Affairs says that the cult of violence sponsored and inspired by the Sangh claimed many victims—the latest and the most precious to fall was Mahatma Gandhi himself.

It adds that members of the Sangh indulged in acts of violence involving arson, robbery, dacoity and murder, collected illicit arms and ammunition, resorted to terrorist methods to create disaffection against the Government and suborn the police and military.

Following is the text of the communique:—

In their resolution of Feb. 2, 1948 the Government of India declared their determination to root out the forces of hate and violence that are at work in our country and imperil the freedom of the nation and darken her fair name. In pursuance of this policy, the Government of India have decided to declare unlawful the Rashtriya Swayam Sevak Sangh in the Chief Commissioners' provinces. Similar action is also being taken in the Governors' provinces.

As democratic governments, the Government of India and the Provincial Governments have always been anxious how far these activities rendered it incumbent on them to deal with the Sangh in its corporate capacity. The last occasion when Government defined this attitude was when the Premiers and Home Ministers of provinces met in Delhi in conference towards the end of November.

It was then unanimously agreed that the stage when the Sangh should be dealt with as an association had not yet arrived and that individuals should continue to be dealt with sternly as hitherto. The objectionable and harmful activities of the Sangh have, however, continued unabated and the cult of violence sponsored and inspired by the activities of the Sangh has claimed

গান্ধীজীর মৃত্যুর পরের দিনের ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।

আর এস এস-কে নিষিদ্ধ করাই নেহরুর উদ্দেশ্য ছিল, গান্ধীহত্যা অজুহাত মাত্র

এস এস-কে নিষিদ্ধও করেছে। কিন্তু গান্ধী-আর এস এস সম্পর্কের বিষয়টিতে তাঁরা কখনো দৃষ্টিপাত করেননি। করলে, তাদের সামনে সংশয়ের পর্দাটি দূর হয়ে যেত। কেমন ছিল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সঙ্গে আর এস এসের সম্পর্কটি? ১৯২৫ সালে নাগপুরে আর এস এস নামক সংগঠনটি শুরু হয় ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের নেতৃত্বে। এর ন' বছর পর ১৯৩৪ সালে গান্ধীজী আর এস এস সম্পর্কে সম্যক অবহিত হন। আর এস এস-কে কাছ থেকে দেখার এবং জানার সুযোগ ঘটে গান্ধীজীর। ১৯৩৪-এর ২৩, ২৪ এবং ২৫ ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধায় আর এস এসের শীতকালীন শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শেঠ যমুনালাল বাজাজের খামারবাড়িতে। প্রায় দেড় হাজার স্বয়ংসেবক এই শিবিরে অংশ নিয়েছিলেন। এই শিবিরের পাশেই সত্যাগ্রহ আশ্রমে গান্ধীজী তখন অবস্থান করছিলেন। আশ্রম থেকে সঙ্ঘের শিবিরে স্বয়ংসেবকদের কার্যকলাপ দেখে গান্ধীজী উৎসাহী হয়ে পড়েন এবং শিবির পরিদর্শন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

সেই মতো ঠিক হয় ২৫ তারিখ সকালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী সপারিষদ শিবির পরিদর্শন করতে আসবেন।

২৫ ডিসেম্বর সকালে মীরা বেন, মহাদেব দেশাইসহ ২৫-৩০ জনকে সঙ্গে নিয়ে গান্ধীজী শিবির পরিদর্শন করতে আসেন। গণবেশ পরে স্বয়ংসেবকরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। গান্ধীজীকে শিবিরের সকল বিভাগ ঘুরিয়ে দেখানো হয়। শিবিরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং শৃঙ্খলা গান্ধীজীকে উৎফুল্ল করে। শিবিরে উপস্থিত স্বয়ংসেবকরা তাঁকে জানান— 'আমরা জাতিভেদ মানি না। কে কোন জাত জানতেও চাই না। আমরা সকলেই হিন্দু, সকলেই ভাই। উঁচু-নীচুর ভেদ আমাদের মধ্যে নেই।' স্বয়ংসেবকদের এই কথায় আনন্দিত হয়েছিলেন গান্ধীজী। শিবিরের অধিকারী আপ্পাজী যোশীকে গান্ধীজী বলেন--- 'এ চমকপ্রদ কাজ আপনারা করেছেন কী করে? আমি ও আরও কিছু সংগঠন তো চেষ্টা করছি, কিন্তু মানুষ এসব ভেদাভেদ টিকিয়ে রাখতেই চায়।' গান্ধীজী যখন শিবির পরিদর্শনে এসেছিলেন, সেই সময় ডাঃ হেডগেওয়ার শিবিরে ছিলেন না। কিন্তু গান্ধীজী ওঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পরে ডাঃ হেডগেওয়ার শিবিরে এসে পৌঁছলে সত্যাগ্রহ আশ্রম থেকে স্বামী আনন্দ এসে ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করেন এবং গান্ধীজীর হয়ে আমন্ত্রণ জানান। আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ২৫ তারিখ রাত সাড়ে আটটার সময় ডাক্তারজী সত্যাগ্রহ আশ্রমে যান গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সঙ্গে ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের এটিই প্রথম সাক্ষাৎকার। সত্যাগ্রহ আশ্রমে সেদিন এই দুজনের ভিতর এক ঘণ্টা একান্ত আলাপচারিতা হয়েছিল। গান্ধীজী ওই আলাপচারিতার সময়ই ডাক্তারজীকে বলেন— 'আপনি যে উন্নত ভাব নিয়ে সংগঠন গড়ছেন, যে আশ্চর্য শৃঙ্খলা সৃষ্টি করছেন তা দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।' যতদিন জীবিত ছিলেন, আর এস এস সম্পর্কে এই উচ্চ ধারণাই কিন্তু মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী পোষণ করে গিয়েছেন। স্বাধীনতার পরে, ১৯৪৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লিতে আর এস এসের একটি সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে গান্ধীজী বলেন, 'আর এস এস শিবিরে যে শৃঙ্খলা, যে নিয়মানুবর্তিতা দেখেছি— তা আমাকে বরাবর মুগ্ধ করেছে।'

স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে গান্ধীজী।

১৯৩৪ সালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সঙ্গে আর এস এসের সম্যক পরিচয়ের পর যতদিন গিয়েছে, ততই আর এস এস যেমন ভারতের সমাজ জীবনের সঙ্গে আরও একাত্ম হয়েছে, আরও প্রাসঙ্গিক হয়েছে, তেমনই তার প্রভাব এবং প্রসারও দ্রুত ঘটেছে। স্বভাবতই গান্ধীজীও আর এস এস সম্পর্কে আরও বেশি ওয়াকিবহাল হয়েছেন, আগ্রহী হয়েছেন। এমনকী, দেশ ও জাতির সংকটের মুহূর্তে আর এস এসকে অস্বীকারও করতে পারেননি গান্ধীজী। বরং আর এস এসের সহযোগিতাই কামনা করেছেন তিনি। ইতিহাস তার সাক্ষী হয়ে রয়েছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর পরই গান্ধীজী দিল্লিতে একটি হরিজন বস্তিতে বসবাস শুরু করেন। এই হরিজন বস্তির উল্টোদিকেই ছিল একটি মুসলমান মহল্লা। তখনও দেশের ভিতর সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। গান্ধীজীর নিরাপত্তার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার সেইসময় চেয়েছিল হরিজন বস্তিতে গান্ধীজীর আবাসগৃহ ঘিরে সেনা প্রহরার ব্যবস্থা করতে। গান্ধীজী এই সেনা প্রহরা নিতে রাজি ছিলেন না। অগত্যা কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতা কৃষ্ণন নায়ার আর এস এসের বরিষ্ঠ প্রচারক বসন্তরাও ওকের সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ করেন সঙ্ঘ যেন গান্ধীজীর নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়। সেই মতো বসন্তরাও ওক গান্ধীজীর নিরাপত্তার জন্য সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের নিয়োগ করেন। কৃষ্ণন নায়ারের মতো কংগ্রেস নেতারা বুঝেছিলেন গান্ধীজীর নিরাপত্তা সঙ্ঘের হাতেই অটুট থাকবে। এইরকম একটি সময়ই মুসলিম লিগ পরিকল্পনা করে, দিল্লির বুকে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এবং অতর্কিত হামলা চালিয়ে মন্ত্রী এবং গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের হত্যা করে দিল্লি দখল করে নেওয়া হবে। কিন্তু সঙ্ঘের কিছু স্বয়ংসেবক এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে যান এবং তারা এ বিষয়ে সরকারকে সতর্কও করে দেন। এ প্রসঙ্গে ভারতরত্ন ড. ভগবানদাস লিখেছেন— 'মুসলিম লিগের আস্থা অর্জন করে ভিতরের খবর বের করার জন্য কয়েকজন স্বয়ংসেবক ইসলাম ধর্মও গ্রহণ করে। তাঁরাই মুসলিম লিগের এই ষড়যন্ত্রের খবর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলের কাছে পৌঁছে দেন। তাদের কাছ থেকে এই সংবাদ পেয়েই সরকার এই ষড়যন্ত্রকারীদের ধরে ফেলতে সমর্থ হয়। সেদিন যদি স্বয়ংসেবকরা ওই সংবাদ পৌঁছে না দিত— তাহলে ভারতে আজ আর নিজেদের সরকার থাকত না।'

এইসব ঘটনা যখন দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে, সেই সময়, ১৯৪৭ সালের

৯ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর (শ্রীগুরুজী)-কে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানান গান্ধীজী। আমন্ত্রণ পেয়ে শ্রীগুরুজী লালা হংসরাজকে সঙ্গে নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে যান। যে ভয়াবহ পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে দেশ যাচ্ছে— তা নিয়ে গান্ধী-গোলওয়ালকরের ভিতর বিস্তৃত আলোচনা হয়। গান্ধীজীকে সঙ্ঘ সম্পর্কে কেউ ভুল বার্তা দিয়েছিল। আলোচনার সময় গান্ধীজী গুরুজীকে বলেন, 'আপনার হাত নিশ্চয়ই রক্তে রঞ্জিত?' উত্তরে শ্রীগুরুজী গান্ধীকে বলেন— 'সঙ্ঘ কখনও প্রতিহিংসা শেখায় না। অযথা কাউকে আক্রমণ করতেও সঙ্ঘ বলে না। কিন্তু আত্মরক্ষা করতে শেখায় সঙ্ঘ।' ওই আলোচনার সময়ই গান্ধীজী শ্রীগুরুজীকে অনুরোধ করেন, শান্তি বজায় রাখতে একটি লিখিত বিবৃতি দিতে। শ্রীগুরুজী বলেন, 'আমার কথা কে শুনবে? সবাই বরং আপনার কথাকেই মান্যতা দেবে। ভালো হয়, আপনি একটি লিখিত বিবৃতি দিন। তাতে বলে দিন যে, আমি আপনার মতামতকে মান্যতা দিয়েছি।' অবশেষে সেই মতো একটি বিবৃতি দেন গান্ধীজী। তাতে বলা হয়, 'শান্তি রক্ষায় পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন গোলওয়ালকর।'

১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে প্রয়াত হন গান্ধীজী। আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধী হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে জওহরলাল নেহরু সরকার আর এস এসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এখন প্রশ্ন হলো— যে আর এস এস গান্ধীজীকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে বরাবর, সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেছে তাঁর দিকে, এমনকী স্বাধীনতার পর পর ওই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার দিনগুলিতে দিল্লিতে গান্ধীজীর নিরাপত্তার দায়িত্বও গ্রহণ করেছে— তারা কি সত্যি সত্যিই গান্ধী হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকতে পারে? নাকি, আর এস এস-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করাটাই প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল— গান্ধী হত্যায় আর এস এসের নাম জড়িয়ে দেওয়াটা ছিল অছিলামাত্র? ঐতিহাসিক তথ্য কিন্তু প্রমাণ করে, গান্ধী

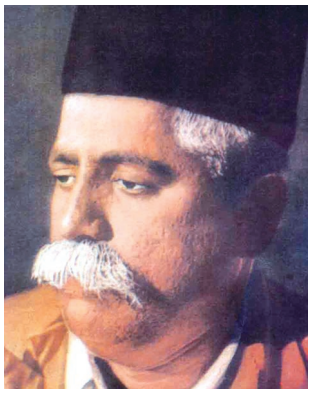

ডা. কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার

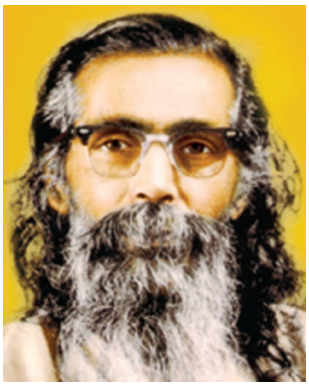

এম এস গোলওয়ালকর

হত্যার অনেক আগে থেকেই আর এস এসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পরিকল্পনা করছিল নেহরু সরকার। গান্ধী হত্যা তাদের সামনে সেই পরিকল্পনাটি রূপ দেওয়ার একটি সুযোগ এনে দিয়েছিল।

স্বাধীনতার পরপরই নেহরু এবং কংগ্রেসের তোষণের রাজনীতি প্রত্যক্ষ করে মানুষ বীতশ্রদ্ধ হচ্ছিলেন। তদুপরি সেই সময় পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পরিবার অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত হয়ে এদেশে আশ্রয়প্রার্থী হচ্ছিল। এইরকম একটি পরিস্থিতিতে সঙ্ঘের প্রভাব এবং জনপ্রিয়তাও ক্রমশ বাড়তে থাকে। এবং সঙ্ঘের এই জনপ্রিয়তা যতই বাড়তে থাকে, ততই কংগ্রেসের ভিতর জওহরলাল নেহরু এবং নেহরুপন্থীরা সঙ্ঘের কট্টর বিরোধী হয়ে উঠতে থাকেন। ১৯৪৭-এর অক্টোবরে দিল্লিতে সরসঙ্ঘচালক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকরের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর দীর্ঘ এক ঘণ্টা বৈঠক হয়। গোলওয়ালকর ওই বৈঠকেই লক্ষ্য করেন, সঙ্ঘের প্রতি নেহরুর মনোভাবটি বৈরিতার। ওই বৈঠকে গোলওয়ালকর নেহরুকে বলেন, 'সরকারেরই উদ্যোগ নেওয়া উচিত এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করা, যেখানে সহযোগিতার মনোভাব সবার ভিতর থাকবে।' কিন্তু নেহরু সরকারের এই বৈরিতার মনোভাব ক্রমশ প্রকট হয়ে পড়ল। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে পুণেতে আর এস এসের একটি শিবির অনুষ্ঠিত হবার কথা দিল। সারা দেশ থেকে এক লক্ষ স্বয়ংসেবকের সেই শিবিরে যোগদান করার কথাও ছিল। ঠিক ছিল প্রধান অতিথি রূপে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল শিবিরে উপস্থিত থাকবেন। অল ইন্ডিয়া রেডিও শিবিরের ধারাবিবরণী প্রচার করবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মহারাষ্ট্র সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর শিবির করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বসল। এর ঠিক পরের মাসেই দিল্লিতে সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের একটি বৈঠকে ডাকলেন প্রধানমন্ত্রী নেহরু। বৈঠকে মূল আলোচ্য বিষয়ই ছিল— সঙ্ঘের দ্রুত উত্থান কী উপায়ে আটকানো যাবে। এই সময়ই মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে স্বয়ংসেবকদের হেনস্থা করাও শুরু হলো। উত্তরপ্রদেশের কাণ্ডালেতে তিনজন স্বয়ংসেবকের বিরুদ্ধে দাঙ্গা বাঁধানোর অভিযোগ এনে তাদের গ্রেপ্তার করা হলো। পরে, আদালতে তাঁরা নির্দোষ সাব্যস্ত হলেন। ১৯৪৭ সালের ১৩ অক্টোবর, মহারাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক কাল' সংবাদপত্রে লেখা হলো— 'মহারাষ্ট্রের সাতারা কংগ্রেস কমিটি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বি জি খেরকে বলেছে, আর এস এসকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। সরকার যদি এই কাজ করতে অপারগ হয়, তাহলে কংগ্রেস কর্মীরাই সন্ত্রাসের পথ অবলম্বন করে তা করবে। এর উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস কমিটিকে বলেছেন, এখনই এ নিয়ে চূড়ান্ত পদক্ষেপ করবেন না। করলে আমরাই ধ্বংস হয়ে যাব।' সঙ্ঘ সম্বন্ধে কতখানি প্রতিহিংসামূলক মনোভাব তখনই হয়ে গিয়েছিল কংগ্রেস নেতাদের তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই রিপোর্টেই প্রমাণ। ১৯৪৮ সালের ১৭ জানুয়ারি, গান্ধী হত্যার দু-সপ্তাহ আগে দিল্লিতে অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে আর এস এসের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব দেখিয়ে একটি

প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো। ওই প্রস্তাবে বলা হলো, আর এস এসের বৃদ্ধি রুখতে সবকটি রাজ্য সরকারেরই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। ওই সময়ই উত্তরপ্রদেশের সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফি আহমেদ কিদোয়াইয়ের উদ্যোগে কেন্দ্র সরকার একটি নির্দেশিকা জারি করে বলে— 'কোনো সরকারি কর্মচারী যদি আর এস এসের সঙ্গে জড়িত থাকেন, তাহলে তা বেআইনি কাজ বলে গণ্য হবে।

কিন্তু নেহরু এবং নেহরুপন্থীরা আর এস এসের প্রতি এমন দমন নীতি গ্রহণ করতে চাইলেও, কংগ্রেসের ভিতরেই অনেকের তা নিয়ে আপত্তি ছিল। মধ্যপ্রদেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দ্বারিকাপ্রসাদ মিশ্র বলেছিলেন, 'লাঠি হাতে নিয়ে সঙ্ঘ কেন্দ্রে সরকারকে উৎখাত করবে— এই ধারণাটিই তো হাস্যকর। আমি কখনই মনে করি না আর এস এস একটি রাজনৈতিক সংগঠন এবং তা নেহরু সরকারকে উৎখাত করতে চাইছে।' ১৯৪৭এর ১৯ ডিসেম্বর নবভারত টাইমস পত্রিকায় দ্বারিকাপ্রসাদের এই বক্তব্যটি প্রকাশিত হয়। সঙ্ঘকে কেন্দ্র করে নেহরুর সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলেরও মতপার্থক্য সামনে আসছিল। সঙ্ঘের বিরুদ্ধে দমননীতিতে প্যাটেলও বিশ্বাসী ছিলেন না। ১৯৪৮ সালের ৬ জানুয়ারি এক প্রকাশ্য সমাবেশে প্যাটেল বলেন, 'কংগ্রেসের উচিত ক্ষমতার আশ্রয় নিয়ে সঙ্ঘকে দমন করার বদলে অন্যভাবে তাদের দেখা। শুধুমাত্র আইনের আশ্রয় নিয়ে একটা সংগঠনকে দমিয়ে রাখা যায় না। সঙ্ঘ নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে। তারা প্রকৃতই দেশপ্রেমিক। দেশমাতৃকাকে ভালোবাসে তারা।' এর জবাবে অমৃতসরে একটি জনসভায় নেহরু বললেন, 'সঙ্ঘ আর হিন্দু মহাসভার লোকরা জাতীয় পতাকার অবমাননা করেছে। ওরা দেশদ্রোহী। ওদের আমি শেষ করে দেব।' এরও আগে ১৯৪৭-এর ২৬ নভেম্বর দিল্লি থেকে প্রকাশিত ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হলো— 'নেহরু পঞ্জাব সরকারের নির্দেশ দিয়েছেন আর এস এস এবং অকালি দলকে ওই রাজ্যে নিষিদ্ধ করতে।' গান্ধী হত্যার মাত্র একদিন আগেও, পঞ্জাবে দলীয় কর্মীদের সভায় নেহরু কঠোর হাতে আর এস এসকে দমন করার নির্দেশ দিয়ে আসেন। শুধু কংগ্রেসের অন্দরে বল্লভভাই প্যাটেল নন, সেই সময়ের আরও বহু বিশিষ্টজনই নেহরুর এই সঙ্ঘ বিরোধী আচরণ মেনে নেননি। ১৯৪৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর কর্ণাটক কেশরী হিসাবে খ্যাত গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডে বলেন— 'আমাদের দেশের শান্তি এবং অখণ্ডতা রক্ষার জন্য হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করা একান্ত জরুরি। সরকারি ক্ষমতায় যারা আছেন, তাদের কাছে আমি অনুরোধ করি, এই সংগঠনকে (আর এস এস) দমন করার চেষ্টা করবেন না। বরং সংকটের সময় এরাই আপনাদের ত্রাতা হয়ে দাঁড়াবে।'

১৯৪৮ সালে গান্ধী হত্যার অনেক আগের এসব ঘটনা। এইসব তথ্যের দিকে চোখ বোলালে বোঝাই যায় আর এস এসকে নিষিদ্ধ করার একটি বাসনা নেহরু এবং নেহরু অনুগামীদের অন্তরে ছিলই। তারা শুধু একটি অছিলা খুঁজছিলেন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারির শেষ দিকে নাথুরাম গডসের গুলিতে নিহত হলেন গান্ধীজী। আর এস এসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল জওহরলাল নেহরুর সরকার। সরসঙ্ঘচালক গুরুজীকে ৩০২ ধারায় গ্রেপ্তার করা হলো। সরকারের ভাবখানা এমন ছিল যেন শ্রীগুরুজীই গান্ধীজীকে হত্যা করেছেন। অবশ্য ভুল বুঝতে পেরে ২৪ ঘণ্টার ভিতরই ওই ধারাটি সরিয়ে নিয়ে অন্য ধারা দেওয়া হয়। বিভিন্ন জায়গায় আর এস এস স্বয়ংসেবকদের ওপর নির্যাতন নেমে আসে। বহু জায়গায় তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে লুঠ করা হয়। কিন্তু আর এস এস যে গান্ধী হত্যার সঙ্গে কখনই জড়িত ছিল না, তা তখনই তদন্তে প্রমাণিত হয়। পুলিশ আধিকারিক সঞ্জিবীর নেতৃত্বে গোয়েন্দা দপ্তর গান্ধী হত্যার ১৭ দিনের মাথায় যে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করে তাতেও বলা হয়, এই হত্যার সঙ্গে আর এস এসের কোনো যোগ নেই। নেহরু সরকার অবশ্য এই রিপোর্টটিকে সম্পূর্ণ চেপে রেখে দেয়। নাথুরাম গডসে তাঁর স্বীকারোক্তিতেও কখনো আর এস এসের জড়িত থাকার কথা বলেননি। গান্ধী হত্যা মামলাতেও কখনো আর এস এসের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ ওঠেনি। তবু গান্ধী হত্যার সঙ্গে আর এস এস জড়িত এই মিথ্যা প্রচার গত সত্তর বছর ধরে চলেছে।

আর এস এসের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা জারি করার পক্ষপাতী ছিলেন না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্যাটেল। তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকরকে প্যাটেল একটি পত্রে লিখেছিলেন— 'আমি বিশ্বাস করি যে কংগ্রেসে যোগ দিয়েই সঙ্ঘ তাদের দেশপ্রেমের কাজ করতে পারবে।' যদি সঙ্ঘ কংগ্রেসে যোগ দেয় তবে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আশ্বাসও প্যাটেল দিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্নই মনে জাগে, যদি সত্যই গান্ধী হত্যার সঙ্গে যোগ থাকত সঙ্ঘের, তাহলে তাকে এত সহজে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার আহ্বান কি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল জানাতে পারতেন?

সঙ্ঘ গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে, তার প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে, সংকটের সময় গান্ধীজীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তাও নিশ্চিত করেছে। তবু মিথ্যা কালিমালিপ্ত করা হয়েছে সঙ্ঘকে। আর কংগ্রেস? জীবনের শেষ প্রান্তে গান্ধীজী আবিষ্কার করেছেন নেহরু, আজাদ, প্যাটেলের মতো তাঁর অনুগামীরা কংগ্রেস নামক সংগঠনটি নিয়ে অনেক দূরে সরে গিয়েছেন। গান্ধীজী তখন একা, হতাশ এবং বিষণ্ণ। নীরবে অশ্রুমোচন ছাড়া আর কিছু করার ছিল না তখন তাঁর। মনে পড়ছে মহাভারতের জড়ভরতের উপাখ্যানটি। রাজা ভরত তপস্যায় বসেছিলেন সিদ্ধিলাভ করার জন্য। সিদ্ধিলাভের দ্বারপ্রান্তে যখন তিনি এসে পৌঁছেছেন, তখন অরণ্যের এক হরিণ শাবকের ভালোবাসায় পড়ে গেলেন তিনি। শাবকটিকে তিনি সন্তানের স্নেহে লালনপালন করলেন। শাবকটি রাজা ভরতের স্নেহে পরিচর্যায় এক সময় বড় হয়ে উঠল। তারপর একদিন ছেড়েও গেল রাজা ভরতকে। রাজা ভরতের আর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা হলো না। তিনি হয়ে গেলেন জড়ভরত। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী হচ্ছেন সেই জড়ভরত, আর কংগ্রেস হলো তাঁকে ছেড়ে যাওয়া হরিণ শাবক। ■

দেশভাগ গান্ধীজীর রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার ফল

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

মালাবারে ধর্মান্তরিত হিন্দু পরিবারের স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন।

সার্ধশতবর্ষে মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে মূল্যায়ন হচ্ছে। তিনি ছিলেন বড় মাপের প্রভাবী রাজনীতিবিদ। সমর্থন করি বা না করি গান্ধীজীকে অনুসরণ করতেই হবে। অন্যথায় আজকের ভারতের সমস্যা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। আমাদের সমস্যার উৎস দেশভাগ— একথা স্বীকার করতেই হবে। গান্ধীজীর রাজনৈতিক কার্যকলাপে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত, কিন্তু তিনি সেই চেষ্টায় সাফল্য পাননি। যেভাবেই দেখি, গান্ধীজীর রাজনীতির একটি রন্ধ্র পথ ছিল— তিনি ধর্মকে কর্মপদ্ধতির সঙ্গে মিলিয়েছিলেন। এর ফলে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে এমন একটি পথ খুঁজতে চেয়েছেন যাকে পশ্চিমি রাজনীতিশাস্ত্রে কল্পরাজ্য নামে অভিহিত করা সম্ভব। ড. নির্মল কুমার বসু গান্ধীজীর রচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ উল্লেখ করেছিলেন : '১৯১৯ সালে কালা রাউলাট আইনটি পাশ হওয়ার পর যখন দেখিলাম সরকার আমাদের সামান্যতম দাবিও পূরণ করিলেন না, তখন আমার ভুল ভাঙ্গিল। তাই, ১৯২০ সালে আমি বিদ্রোহী হইলাম' ('Sclection from Gandhi' ; নির্মল কুমার বসু; নবজীবন পাবলিশিং হাউস;আহমেদাবাদ, ১৯৪৮ খ্রি., ১৪৬ পৃ.)। ১৯১৯-২০-র রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সামান্য সন্ধান করলে গান্ধজীর মন্তব্যটি স্পষ্ট হবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশ শক্তি দেশরক্ষাও দেশ শাসনের নামে নিত্যনতুন অত্যাচার শুরু করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এসময় একটি বিচিত্র ঘটনা ভারতের রাজনীতিকে বদলে দিল। জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড যখন দেশের তরুণ সমাজকে চঞ্চল করছে তখন ভারতের মুসলমানরা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল। এই বিষয়টি ছিল নিছক ধর্মকেন্দ্রিক। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা কোনোদিন ভারতকে নিজেদের দেশ ভাবেনি। ব্যতিক্রম থাকতে পারে, তা থেকেই নিয়মটি প্রমাণিত হয়। ১৯১১-১২ খ্রি. তুরস্ক-ইটালি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ১৯১২-১৩ খ্রি. উত্তর ইউরোপের বলকান অঞ্চলে তুরস্ক সাম্রাজ্য— ক্রমাগত যুদ্ধে রত হয়। এর প্রতিক্রিয়া ঘটে এদেশে বসবাসকারী মুসলমানদের মধ্যে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮ খ্রি.) তুরস্ক জার্মানিকে সমর্থন করে। ভারতের মুসলমান নেতৃত্ব খোলাখুলি তুরস্কের অটোম্যান-সাম্রাজ্যকে সমর্থন করেন। সৌকত আলি-মহম্মদ নেতৃত্ব খোলাখুলি তুরস্কের অটোম্যান-সাম্রাজ্যকে সমর্থন করেন। সৌকত আলি-মহম্মদ আলি তখন ভারতের মুসলমানদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ব্রিটিশ-সরকার তাদের অন্তরীণ করে রাখলেন।

আলি-ভাইরা সাতশো বছর ধরে চলে আসা ধারাবাহিকতার বাইরে ছিলেন না। কুতবউদ্দিন আইবক থেকে দিল্লির কোনো মুসলমানই ৬৩২ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত খিলাফতের বাইরে ছিলেন না। বাগদাদ থেকে তাঁদের জন্য আসত 'খেলাত'। প্রত্যেক শুক্রবার মধ্যাহ্নের নমাজ শেষে ইমাম সুলতানের ক্ষমতা পুনর্নবীকরণ করতেন। সুলতানরা গেছেন, কিন্তু ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত প্রায় একই আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে তুরস্ক সম্রাটের ক্ষমতা খর্ব হলো। ভারতের মুসলমানরা বেদনা বোধ করল। খিলাফত-পুনরুদ্ধারের জন্য নানা দেশের মুসলমানরা অভিযানের প্রস্তুতি নিল। ১৯১৯ খ্রি. ২৭ অক্টোবর খিলাফত-দিবস উদযাপিত হলো। এই উদ্‌যাপনের মূল হোতা আবুল কালাম আজাদ, ফজলুল হক আর আক্রম খাঁ। লখনৌয়ের উলেমারা, বিজনোর দেওবন্দের তালিবানরা খিলাফত আন্দোলনকে তীব্র ভাষায় সমর্থন করতে লাগলেন। বিষয়টি ধর্মান্ধতা ছাড়া কিছু ছিল না। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ : 'Leaders and ulama viewed the European attack on the caliph's

anthority as an attack on Islam and thus a threat to the religous freedom of Muslems under British rule.' (The Oxford Dictionary of Islam ; John.L. Eaposito— মুখ্য সম্পাদক; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস; লন্ডন; ২০০৩ খ্রি. ১৭২ পৃ.)।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিল খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করবে। ২২ নভেম্বর ১৯১৯ খ্রি. দিল্লিতে প্রথম খিলাফত সম্মেলনে অংশ নিলেন গান্ধীজী, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, মদনমোহন মালব্য; যোগ দিলেন মৌলানা আবদুল বারি। হসরত মোহানি, হাকিম আবদুল খাঁ, আসফ খাঁ প্রভৃতি মুসলমান নেতৃত্ব। গান্ধীজী খিলাফত আন্দোলন সমর্থন করলেন, কিন্তু এই আন্দোলন সমর্থন করেননি মুসলিম লিগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্না। তাঁর হুমকি ছিল ইসলামি আন্তর্জাতিকতার নামে এই আন্দোলন মধ্যযুগীয় ব্যবস্থাকে সমর্থন করা ছাড়া কিছু নয়। পরে জিন্না তাঁর অবস্থান বদল করেন। এ নিয়ে আলোচনা এখানে খুব প্রাসঙ্গিক হবে না। প্রায় একক ভাবে খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করলেন গান্ধীজী। কংগ্রেসের বহু গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব এই আন্দোলনে শামিল হওয়া মানেননি। এই বিতর্ক চলতে থাকল। ৩০ ডিসেম্বর ১৯১৯ খ্রি. দ্বিতীয় খিলাফত সম্মেলনের পর গান্ধীজী ঘোষণা করলেন খিলাফত না মানলে তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করবেন। মুসলমান নেতৃবৃন্দ লন্ডনে গেলেন। ১৭ মার্চ ১৯২০ খ্রি. ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের সঙ্গে তাঁদের আলোচনা ব্যর্থ হলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে তুরস্ক সাম্রাজ্য ভেঙে গেল। ভারতের মুসলমান সমাজ হতোদ্যম হলো। কংগ্রেসের সাহায্য না পেলে খিলাফত টিকে থাকতে পারত না। বলা হয় গান্ধীজীর এক কৌশলেই খিলাফত আর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলো ১৭ এপ্রিল ১৯২০ খ্রি. থেকে।

১৯২০ খ্রি. মে মাসে আফগানিস্তানের সাহায্যে মুসলমান নেতারা ব্রিটিশ ভারতকে আক্রমণ করে ব্রিটিশদের উৎখাত করার প্রস্তাব নিলেন! বারাণসীতে এ.আই. সি.সি.-র অধিবেশনে এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হলো। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের এমন বিচিত্র অবাস্তব প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা সত্যি অভাবিতপূর্ব। গান্ধীজী মৌন। অ্যানি বেসান্ত, মতিলাল নেহরু, লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক, মদনমোহন মালব্য তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন। বিপিন চন্দ্র পাল লিখলেন, এই ধর্মান্ধতার গলিতে ঢুকে পড়লে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম মুসলমান-শক্তির হাতের পুতুলে পরিণত হবে। ১৯২০ খ্রি. সেপ্টেম্বর নাগাদ কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে দুই তৃতীয়াংশের সমর্থনে গান্ধীজীর প্রস্তাব মেনে নেওয়া হলো! খিলাফত আর অসহযোগ আন্দোলন জুড়ে দেওয়া হলো। অর্থাৎ মুসলমানরা তাদের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করল, বাকি ভারতবাসী কৃত্রিম ঐক্য স্থাপনের আশু প্রয়োজনে দূরের কথা ভুলে থাকতে বাধ্য হন। খিলাফতের ধর্মান্ধতা আর অসহযোগ আন্দোলনের কৃত্রিম ধর্মনিরপেক্ষতার ফল ফলতে দেরি হলো না। মুশিরুল হাসানের বিশ্লেষণে দেখছি, কেমন করে ধর্মান্ধ মুসলমান সম্প্রদায় সারাদেশে দাঙ্গা পরিস্থিতি তৈরি করল। এর ভয়াবহতম রূপটি দেখা গেল কেরলের মালাবার-ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি অঞ্চলে। একে বলা হয় 'মোপলা দাঙ্গা'। এক হিসাবে ১৯৪৬ খ্রি. কলকাতার ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড (গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং) আর নোয়াখালি হত্যাকাণ্ডের ভূমিকা হিসাবে মোপলা দাঙ্গাকে দেখা উচিত। মুশিরুল হাসানের ভাষায় : 'Moplah Riot... stirred by the Pan-Islamic enphoria, the Moplahs directed their long suppressed anger against the Hindus, desecrated temples and restored to forcible convertion ? (Nationalism and commnunial Politics in India, 1885-1930;' মনোহর; নতুন দিল্লি; ২০০০ খ্রি.; প্রথম সংস্করণ ১৯৯১; ১৬৮ পৃ.)। ১৯২১ খ্রি. জুলাই-আগস্টে মোপলা-বিদ্রোহ ভয়াবহ রূপ নিল। বিমল প্রসাদ তাঁর বইতে লিখেছেন : 'many Hindu temples were desecrated or destroyed and Hindus converted to Islam and killed if they refused.' ('A Nation within a Nation– 1877-1937,' দ্বিতীয় খণ্ড; বিমল প্রসাদ; মনোহর, নতুন দিল্লি, ২০০০ খ্রি.; ২৩ পৃ.)। কত হিন্দু মারা গেছে? অন্তত ৩০ হাজার। ঐতিহাসিকরা জানাচ্ছেন, অন্তত এক লক্ষ হিন্দুকে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল খিলাফত আন্দোলনের এই প্রত্যক্ষ ফলে! আর এদের মধ্যে ধপু 'ইঝাভা' জনগোষ্ঠী ছিল, তাদের নারায়ণ গুরুর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরও ধ্বংস হয়েছে! যাঁরা দলিত-মুসলমান ঐক্য নিয়ে উচ্ছ্বসিত তাঁরা এসব তথ্য আড়াল করেন। তাঁরা ইতিহাস জানেন? মতের অন্ধত্ব কখনো মানুষের মনের অন্ধত্ব দূর করতে পারে না।

কমিউনিস্টরা প্রচার করেন মোপলা বিদ্রোহ আসলে কৃষক- বিদ্রোহ। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি হয়েছে তাসখন্দ শহরে। এরা অনেকেই খিলাফত আন্দোলনে অংশ নিতে গিয়েছিলেন! কামাল আতাতুর্ক ১৯২২ খ্রি. তুরস্কের শাসক হন— খিলাফত লুপ্ত হয়। দেশে যাঁরা ধর্মান্ধ মোপালা বিদ্রোহকে কৃষক বিদ্রোহ বলেন, খিলাফতের ব্যর্থতাকে সাম্যবাদী দল প্রতিষ্ঠায় পরিণত করেন, তাঁদের কাছে কিছুই আশা করা ঠিক নয়।

গান্ধীজী খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন এক সূত্রে বেঁধে যে বিষবৃক্ষ পুঁতেছেন, তাই দুই দশক পরে দেশভাগের মধ্য দিয়ে পূর্ণ রূপে লাভ করল। অ্যানি বেসান্ত লিখেছেন :'Malabar has taught us what Islamic rule still means, and we do not want to see another of specimen of the khilafat Raj in India.' ('The Future of Indian Politics ; A contribution to the Understanding of Present Day Politics'; কিসিঞ্জার প্রকাশন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; ২৫২ পৃ.)। গান্ধীজী ভবিষ্যতের পরিণতিকে কি জেনেও বুঝতে চাননি? বিশ্লেষণ বিস্তারিত হওয়া দরকার। ■

ভারতের গোসম্পদ ও গব্যযন্ত্রণা

গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত কৃষি প্রধান দেশ। আজকের এই শিল্পোন্নয়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির যুগেও ভারতের ষাট শতাংশের বেশি মানুষ সরাসরি কৃষি ও সংশ্লিষ্ট পেশায় যুক্ত। আমাদের এই দেশের বিস্তার বিষুবরেখার কাছ থেকে আরম্ভ হয়ে সমস্ত ক্রান্তীয় মণ্ডল পার করে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অভ্যন্তরে পৌঁছেছে। এদেশের পূর্বাঞ্চল যেমন রয়েছে বিশ্বের সর্বাধিক বৃষ্টি বিধৌত অঞ্চল, তেমনই রয়েছে দেশের পশ্চিমে প্রায় বৃষ্টিহীন মরু অঞ্চল। এ দেশেই রয়েছে আদিগন্ত বিস্তৃত বহু সহস্র যোজনব্যাপী ঊর্বর সমভূমি, আবার তারই প্রান্তে গগনভেদ করে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বের সর্বোচ্চ শৈলশ্রেণী। হিমালয়ের হিমমণ্ডলে যেমন শৈত্য প্রধান অঞ্চল রয়েছে তেমনই রয়েছে দেশের দক্ষিণ প্রান্তে সংবৎসর উষ্ণতা নিয়ে শীতহীন অঞ্চল। সত্যই ভারত এক বিচিত্র দেশ। বৈচিত্র্য ভারতের সর্বত্র। ভূপ্রকৃতির বৈচিত্র্য, জলবায়ুর বৈচিত্র্য, কৃষি সম্পদের বৈচিত্র্য, স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈচিত্র্য, পশুসম্পদের বৈচিত্র্য, মানবজাতির বৈচিত্র্য— সর্বক্ষেত্রেই বৈচিত্র্যের যেন শেষ নেই। এই বৈচিত্র্য যেমন আকৃতিগত তেমনই গুণগত।

অন্যান্য বহু সম্পদের মতো ভারতের গোসম্পদও বৈচিত্র্যে ভরপুর। পূর্বভারতের খর্বকায় স্বল্পদুগ্ধপ্রদায়ী যে গোরু আমরা বাংলা ও অসমে সচরাচর দেখি তেমন জাতের গোরু একেবারে দক্ষিণে কেরল ও সংলগ্ন অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও নেই। এই জাতীয় গোরু এসব অঞ্চলের আর্দ্র ও অতিআর্দ্র জলবায়ুতে নিজেদের খাপ খাইয়ে বিশেষ কোনও যত্ন ছাড়াই বেঁচে থাকে ও বংশবৃদ্ধি করতে পারে। গৃহস্থের প্রয়োজনে এগুলি পালিত হয় ও এদের থেকে যা দুধ পাওয়া যায় তার দ্বারা তেমন ভাবে দুগ্ধ ব্যবসায় হয় না। কৃষিকাজে বা ভারবহনে বলদগুলি স্থানীয় ভাবে ব্যবহৃত হলেও সামর্থ্যের দিক দিয়ে তুলনামূলক ভাবে পশ্চিমের বলদ থেকে এগুলির সামর্থ্য অনেক কম। অসম ও বাংলা ছাড়িয়ে আমরা যত পশ্চিমের দিকে যেতে থাকি ততই বৃষ্টির পরিমাণ কমতে থাকে ও গবাদি পশু আকারে ও আয়তনে বাড়তে থাকে। বিহারের শাহাবাদী, গঙ্গাতীরী, বচৌর ইত্যাদি প্রজাতির গোরু বেশি দুধ দেয় না কিন্তু আকারে বড় এদের বলদগুলি লাঙল ও গাড়িটানার কাজে সমগ্র উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতে ব্যবহৃত হয়। সাদা রঙের বড়ো বড়ো আকারের এ জাতীয় বলদের সঙ্গে সকল বঙ্গবাসীই পরিচিত। আরও পশ্চিমের আমরা যেসব প্রজাতির গোরু দেখি সেগুলি প্রধানতর দুগ্ধপ্রদায়ী। ভারতের গোবলয়ে রয়েছে দুগ্ধপ্রদায়ী গোরুর প্রাধান্য।

ভারতের গোবলয়ের বিস্তার মহারাষ্ট্রের উত্তর অংশ থেকে আরম্ভ করে গুজরাট, রাজস্থান, পঞ্জাব, হরিয়ানা হয়ে উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম অংশ পর্যন্ত। এই অঞ্চলটি মোটের ওপর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে পড়ে। এখানে বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে বড়ো বড়ো ঘাস জন্মায়। যেসব জায়গায় সেচের সুবিধা আছে সেখানে খুব ভালো গম ও ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ প্রজাতির ধান ও অন্যান্য ফসল হয়। কিন্তু সেচহীন অঞ্চলে তৃণভূমির প্রসারই লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গভূমিতে তৃণভূমির বড়ই অভাব। অতীতে ধর্মীয় কারণে ও সামাজিক ব্যবস্থায় যেসব তৃণভূমি গোচারণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল বর্তমানে সেগুলি প্রায়

সবই কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে অরণ্যভূমি যেমন কৃষির জন্য অধিকৃত হয়েছে তেমনই তৃণভূমিও কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। এখানকার উর্বর মাটি, উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু কৃষিকর্মের জন্য আদর্শ। নিবিড় কৃষিপদ্ধতিতে চাষ হওয়া বছরের বারোমাসই কৃষিক্ষেত্রে ফসল দেখা যায়। ফলে গোচারণের জন্য ভূমি প্রায় নেই বললেই চলে। পশ্চিমের গোবলয়ে কিন্তু পরিস্থিতি ভিন্ন। সেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। তাই সেচহীন ক্ষেত্রে বর্ষাকাল ছাড়া চাষ হয় না। সেগুলি পশুচারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। সেখানকার অর্থনীতিতে কৃষি ও পশুপালন সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। গোবলয়ের পশ্চিমাংশে কৃষির থেকে গোপালনের গুরুত্ব বেশি। এই অঞ্চলের গবাদি পশুর মধ্যে গির, শাহীওয়াল, সিন্ধী, হরিয়ানী, রাঠী, থার্পারকর ইত্যাদি প্রজাতির গাভী প্রধান, যেগুলি প্রতি বিয়ানে প্রায় চার-পাঁচ হাজার কিলো দুধ দেয়। এই সব প্রজাতির মধ্যে সর্বপ্রধান গুজরাটের গির প্রজাতির গাভী যেগলির দুধের পরিমাণ ছয় হাজার কিলোও হয়। গোবলয়ের অর্থনীতি দুধকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। সেসব জায়গার মানুষদের জীবিকার প্রধান সম্বল এই দুগ্ধপ্রদায়ী গাভী। এক একটি গাভীর মূল্য সেখানে দেড়-দুই লক্ষ টাকা পর্যন্তও হয়। ফলে যার চার-পাঁচটি এমন গাভী থাকে সে ধনী বলে গণ্য হয়। গোধন চুরি সে সব অঞ্চলে অতি সাধারণ ব্যাপার। গোধন রক্ষার জন্য গোরক্ষক থাকে গ্রামে গ্রামে। বাংলাতেও গোরক্ষী সভা হতো। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময়ে তার সদস্য ছিলেন।

ভারতের গোজাতির পিঠে কুঁজ দেখা যায় ও এগুলি পশ্চিম গোলার্ধের কুঁজহীন সমান পিঠের গোজাতির থেকে ভিন্ন। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে ভারতীয় গোরুর দুধ পানে এলার্জি হয় না এবং এর পুষ্টিগুণ বেশি হয়। এজন্য অস্ট্রেলিয়ায় আমাদের দেশের গোরু নিয়ে গিয়ে পালন করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বলা হচ্ছে ভারতীয় জাতের সবৎসা গাভীর মূত্র থেকে অত্যন্ত কার্যকরী কীটনাশক তৈরি হয় যা রাসায়নিক কীটনাশক থেকে সবদিকে ভালো। ফলে দেশীয় গোপালকেরা যেমন গোদুগ্ধ বিক্রি করছে তেমনই অনেক জায়গায় গোমূত্রও বিক্রি হচ্ছে এবং তা কোথাও কোথাও গোদুগ্ধের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। তার ফলে মহার্ঘ গোরু আরও মহার্ঘ হয়েছে।

আমাদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে— 'জোরু, গোরু, ধান'— দেখ বিদ্যমান, এগুলির বিষয়ে কখনই অসাবধান হওয়া চলবে না। এখানে অন্যকে জব্দ করতে তার জমির ধান কেটে নেওয়া হয়, শত্রুতা করে ধানের ক্ষেতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়, অন্যের পাকা ধানে মই দেওয়া হয়। এখানে ক্ষতি করা হয় ধানকে কেন্দ্র করে। গোরু এখানে তেমন বড়ো সম্পদ না হওয়ায় গো-কেন্দ্রিক কোনও ঘটনা তেমন ঘটে না। কিন্তু গোরু যেখানে অর্থনীতির বনেদ তৈরি করে সেখানে বিষয়গুলি গো-কেন্দ্রিক হয়। গোরু যেখানে মানুষের আয়ের প্রধান উৎস সেখানে গোরুচুরি বা গোরুর ওপর হামলা মানুষ মেনে নেয় না। সেখানে গোরুচুরির অর্থ জীবিকায় হস্তক্ষেপ, পরিবারের ভরণপোষণে হস্তক্ষেপ। তাই তার প্রতিরোধ হয় যা খুবই স্বাভাবিক। প্রতিরোধের ধরন মানুষ ভেদে আলাদা হয়ে যায়। চরমপন্থী, ক্রোধী মানুষ প্রতিবাদে রক্তপাত ঘটায় যা ঘটনাচক্রে খুনোখুনির পর্যায়েও পৌঁছে যায়। প্রশাসন সজাগ হলে গোরুচুরি হওয়া বা গোরুচোরের জনতার হাতে শাস্তি হওয়া— দুই থেকেই মানুষ মুক্তি পায়। সমাজে শান্তি বজায় থাকে।

সামাজিক স্থিতাবস্থা ও অর্থনীতির বিকাশের ব্যাপারে পুষ্যির সংখ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে 'হম দো, হমারে দো' স্লোগানটি স্মরণ করা যেতে পারে। পুষ্যি যেমন মানুষ হয়, গৃহপালিত পশুও তেমনই সংসারে পুষ্যি। পশুর সংখ্যা— এই আলোচনার সূত্রে গবাদি পশুর সংখ্যা, পশু খাদ্যের জোগানের অনুপাতে বেশি হলে মানুষ ঠিক নিজেদের মতো করে তার ব্যবস্থা করে নেয়। যে গোরু দুধ দেয় না বা যে বলদ লাঙল অথবা গাড়ি টানার কাজে লাগে না, শত ন্যায়ের বুলি বা ধর্মকথা বলেও মানুষকে সেই সব পশু গৃহে রেখে পালনের ব্যাপারে রাজি করানো যায় না। তারা ঠিকই সেই সব পশুকে বিক্রি করে দেয়। কাশ্মীরের সোনমাগে দেখেছি, যে অশ্ব বা অন্য পশু ভার বহনে অক্ষম হয়ে যায় তার পালকেরা কোনও উঁচু জায়গা থেকে নীচে খাদে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। সেখানে সিন্দ (সিন্ধু নয়) নদীর ধারে সেরকম একটি প্রাণীকে মৃত্যুমুখে পড়ে থাকতে দেখেছি এবং স্থানীয় ঘোড়াওয়ালারাই সেই ঘটনার কথা শুনিয়েছে। এ নিয়ম সব সমাজেই আছে। বিবেকের দংশন হলে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও আছে। তাই অকর্মণ্য গবাদি পশুর বিক্রি হওয়া চলবেই। এই সূত্রে ছাব্বিশ বছর আগে দেখা ঢাকার উপকণ্ঠের গাবতোলির গোহাটার কথা মনে পড়ছে। সেখানে নদীর ধারে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু গোরু আর গোরু। সাদা রঙের বড় বড় পশ্চিমা গাই। যদিও সেগুলির অধিকাংশই বলদ তবু গাভীও কিছু চোখে পড়েছিল। তুরাগ নদীতে বড় বড় নৌকো বোঝাই করে গো-পরিবহণও দেখেছি। হাট ছিল সেগুলির গন্তব্য। গোরুগুলি যে গঙ্গাতীরবর্তী বা আরও পশ্চিম ভারতের তাও বুঝেছি। সেখানে খকুটে বাংলাদেশি গোরু একটাও চোখে পড়েনি। বিক্রির জন্য গোরুগুলিকে বৃদ্ধ বা অকর্মণ্য মনে হয়নি।

কিছুদিন আগে কাগজে পড়লাম সীমা সুরক্ষা বাহিনীর নজর এড়াতে গোরু পাচারকারীরা গোরুর দুপাশে কলাগাছ বেঁধে নদী পার করাচ্ছে। গোরুর চোরাচালান রোধ করা দুঃসাধ্য এক ব্যাপার বিশেষ করে সরকার যদি সজাগ না থাকে।

গবাদি পশু মানুষের কত বড় সম্পদ তা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের বুঝতে না পারায় দোষ নেই। কিন্তু দেশের পশ্চিমাংশের মানুষের সে সম্পদ প্রাণরক্ষার সঙ্গে জড়িত। সেই সম্পদকে রক্ষা করার দায় যেমন ব্যক্তির রয়েছে তেমনই সরকারেরও রয়েছে। কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে চোরাচালান পথের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিরও দায় বর্তায় গো-সম্পদকে রক্ষা করার। যাতে একটিও উৎপাদনক্ষম গোরু চালান না হয়, যাতে চোরাই গোরু কোনওভাবেই বাজারে না পৌঁছায়। গোরু চুরি বহু পুরাতন পেশা। তাই ক্ষুদ্র সংকীর্ণতায় একে অন্যকে দোষারোপ না করে সবারই উচিত এক যোগে দেশের এই সম্পদগুলি রক্ষা করা। ক্ষুদ্র স্বার্থে লিপ্ত হয়ে এমন কিছু না করা যাতে গোরু চোরেরা প্রশ্রয় পায়। ■

সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর

মণীন্দ্রনাথ সাহা

একদা কলকাতার সংস্কৃত কলেজের এক অধ্যাপক হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যান। সাহেব সে সময় টেবিলের উপর বুটপরা পা'দুটি তুলে চেয়ারে বসেছিলেন। অধ্যাপক তাঁর কাছে গেলে কার সাহেব পা'দুটি ওইভাবে রেখেই অধ্যাপকের সঙ্গে কথা বললেন। অধ্যাপক এতে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না, শুধু মনে মনে বললেন, এর জবাব দিতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে একদিন কার সাহেব সংস্কৃত কলেজে এলেন। অধ্যাপক খবর পেয়ে নিজের চটিজুতা-শোভিত পা'দুটি টেবিলের উপর তুলে এই অহংকারী ইংরেজটির সঙ্গে কথা বললেন। সাহেবকে 'বসবার'ও অনুরোধ করলেন না।

সাহেব পরে শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা মোয়েট সাহেবকে সব কথা জানালেন। মোয়েট সাহেব অধ্যাপককে তলব করলেন। অধ্যাপক হিন্দু কলেজে কারসাহেবের ব্যবহারের কথা বিবৃত করে বললেন, আমি ভেবেছিলাম, টেবিলের উপর জুতাশুদ্ধ পা তুলে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করাই বুঝি বিলাতি রীতি। আমি সেই রীতিতেই সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি।

মোয়েট সাহেব ব্যাপারটা বুঝলেন এবং কার সাহেবকে ভবিষ্যতে শিষ্ট ব্যবহারের জন্য উপদেশ দিলেন।

একদিন বর্ধমান থেকে জরুরি কাজে কালনা যাওয়ার পথে এক ভদ্রলোক দেখতে পেলেন রাস্তার ধারে এক কলেরা রোগী অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছে। রোগীর গায়ে রক্ত, কাপড়ে মলমূত্র। মাছি উড়ছে। শরীর থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। পাশ দিয়ে বহুলোক চলে গেলেও কেউ ফিরেও দেখছে না। তিনি ওই অচৈতন্য রোগীকে দেখে, নিজের কাঁধে সেই রোগীকে তুলে নিয়ে হেঁটে কালনা হাসপাতালে এলেন। সাহেব ডাক্তারকে ডেকে বললেন, ''ডাক্তার একে বাঁচাতেই হবে। কথা দিন ভালো চিকিৎসা হবে।'' ডাক্তার বিস্মিত হয়ে বললেন, চিকিৎসার ত্রুটি হবে না, কিন্তু জানতে ইচ্ছে করে আপনি কে?

এ দুটি ঘটনা থেকে তাঁর সম্পর্কে অনুমান করা যাচ্ছে। তাঁর কথাতেই— ''আমি এমন কেউ নই। লোকে আমাকে বিদ্যাসাগর বলে।'' এই কথা শুনে সাহেব ডাক্তার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। সেদিন অনেকের কাছেই গোটা ঘটনা এবং মানুষটির দৃঢ়তা ও বিনয় ঠেকেছিল অবিশ্বাস্য।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতা ভগবতী দেবী। জন্ম মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। ছোটোবেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। সংসারের অবস্থা সচ্ছল না থাকায় বহু কষ্ট করে যেমন— কলকাতায় নিজে বাজার করে, নিজ হাতে রান্না করে, নিজের জামাকাপড়, ঘরদোর সব পরিষ্কার করে পড়াশোনা করতে হতো। এমনকী কেরোসিনের অভাবে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলোয় তিনি পড়াশোনা করে বড় হয়েছেন। অবশ্য তাঁর এই কষ্ট স্বীকারের যথেষ্ট ফলও লাভ করেছেন। ১৮৯১-র ২৯ জুলাই তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

১৮৫০ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে যোগ দেন। ১৮৫১-তে ওই কলেজেরই প্রথম অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। তাঁর লেখা 'বর্ণপরিচয়', 'বোধোদয়', 'কথামালা',

'আখ্যানমঞ্জরী' প্রভৃতি সহজ সরল ভাষায় লেখা গ্রন্থ। তাঁরই প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়। বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহ নিবারণেও তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। বিধবাবিবাহের জন্য তাঁকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। অপরের দুঃখে সদাই কাতর হতেন। তার জন্য তিনি 'দয়ার সাগর' উপাধি পান। লেখক হিসেবে বিদ্যাসাগর যত না পরিচিত সমাজ-সংস্কারক, পরপোকারী ও বিদ্যোৎসাহী হিসেবে তার চেয়ে বেশি পরিচিত।

কলকাতার এক বিখ্যাত কলেজের অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেবের ঘরে বিদ্যাসাগর প্রবেশ করে বললেন, সাহেব আমাকে ছুটি দিতে হবে। সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, হঠাৎ ছুটি কেন? বিদ্যাসাগর বললেন, 'ভাইয়ের বিবাহের জন্য মা আমায় যেতে চিঠি লিখেছেন, আমাকে বাড়ি যেতেই হবে।' সাহেব বললেন, 'কিন্তু এখন তো ছুটি মিলবে না।' বিদ্যাসাগর চলে গেলেন, কিন্তু সমস্ত রাত্রি ঘুমোতে পারলেন না। পরের দিন সাহেবের কাছে গিয়ে বললেন, 'মা আমাকে বাড়ি যেতে বলেছেন, আমাকে বাড়ি যেতেই হবে। যদি আমাকে ছুটি না দেন আমি এই মুহূর্তেই চাকরি পরিত্যাগ করলাম। মায়ের আদেশ আমাকে পালন করতেই হবে।' সাহেব বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির পরিচয় পেয়ে হেসে বললেন— 'আপনাকে চাকরি ছাড়তে হবে না, আমি ছুটি মঞ্জুর করছি। আপনি বাড়ি যান।'

মুক্ত বুদ্ধির বিদ্যাসাগরের কাছে বাবা, মা ছাড়া কোনও দেবতার স্থান ছিল না। নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণের সন্তান হয়েও অসার ব্রাহ্মণত্বকে কখনও প্রশ্রয় দেননি। প্রাত্যহিক জীবনাচরণে হিন্দুত্বকে আলাদাভাবে কোনও গুরুত্ব দেননি। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'ধর্ম যে কী তাহা মনুষ্যের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবারও কোনও প্রয়োজন নাই।'

রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলেছেন— ''দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বর চন্দ্রের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।'' তিনি আরও বলেছেন— ''তাঁর দেশের লোক যে যুগে বদ্ধ হয়ে আছেন, বিদ্যাসাগর সেই যুগকে ছাড়িয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার প্রমাণ বিদ্যাসাগরের জীবনে জড়িয়ে আছে। তিনি পুজো, সন্ধ্যা আহ্নিক করতেন না। দেবালয়ে যেতেন না, মূর্তি প্রণাম করতেন না, পরকাল মানতেন না, কিন্তু পৈতে ও টিকি রাখতেন। কোনও প্রথাগত নিয়ম তাঁকে বাঁধতে পারেনি।'' তাঁর কাছে তাঁর মা-বাবা জীবন্ত বিশ্বনাথ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে শুদ্ধাত্মা বলেছেন। বিদ্যাসাগরের কাছে সমাজ সেবাই ছিল বড় কাজ। তাই তো তিনি বলেছেন--- ''চোখের সামনে মানুষ অনাহারে মরবে, ব্যাধি, জরা, মহামারীতে উজাড় হয়ে যাবে, আর দেশের মানুষ চোখ বুঁজে ভগবান ভগবান করবে এমন ভগবৎ প্রেম আমার নেই। আমার ভগবান আছে মাটির পৃথিবীতে।'' একজন শিক্ষক হিসেবে তিনি বলেছেন— ''আমরা এমন একদল মানুষ গড়ে তুলতে চাই, যাঁরা মহান শিক্ষকতার মহান দায়িত্ব গ্রহণে উৎসুক হবে। যাঁরা দেশের সকল সংস্কার ও অন্ধত্ব থেকে মুক্ত থাকবে।''

বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন, মেয়েরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হলে সমাজ আরও বেশি কুসংস্কারাচ্ছন্ন থাকবে। তাঁরই প্রচেষ্টায় এ রাজ্যে ৫৫টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত।

দুঃখের বিষয়, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এখনও মেয়েদের সম্পূর্ণভাবে বিদ্যালয়ে পাঠানো সম্ভব হয়নি স্বাধীনতার এত বছর পরেও। নিরক্ষর ছেলে-মেয়েদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য প্রতিটি গ্রামে 'ঈশ্বরচন্দ্র জনচেতনা' গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রকল্প সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত না হওয়ায় প্রথমে সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ যাতে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না হয়, সেই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বশিক্ষা অভিযান এবং পরে সর্বশিক্ষা মিশন প্রকল্প নিয়েছে। বর্তমান মোদী সরকারের 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' প্রকল্প বিদ্যাসাগরের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

আর নিজে হিন্দু ব্রাহ্মণ হয়েও বর্ধমানের আর্ত মুসলমান এবং 'অস্পৃশ্য' হাড়ি-মুচি-ডোম সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়ানোর সাহস এবং স্পর্ধা দেখাতে পেরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেছিলেন : ''Iswar Chandra was a Hindu and Brahmin too. But to him, Brahmin and Sudra, Hindu and Muslim were all alike.'' এখানেই বিদ্যাসাগর প্রকৃত অর্থে আধুনিক মানুষ।

বিদ্যাসাগরের ১৯৭ তম জন্মদিবসের প্রাক্কালে তাঁর স্মৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে তাঁর মতো আধুনিক মানবতার পূজারি সমাজ-সংস্কারের এখনও খুব প্রয়োজন। ■

দুর্গা নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ

মেঘদূত ভুঁই

কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত নারায়ণ উপনিষদে প্রথম 'দুর্গা' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। যাজ্ঞিকা উপনিষদপ্রোক্তা 'দুর্গি' শব্দটিও দুর্গা শব্দের অভিন্ন রূপ বলে পণ্ডিতেরা মত প্রকাশ করেছেন। তাই বলা যায় 'দুর্গা' শব্দটি অতিশয় প্রাচীন।

দুর্গা নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—শাস্ত্রবচনে বলা হয়, 'দ' বর্ণটি দৈত্যনাশক, 'উ'-বিঘ্ননাশক, রেফ-অর্থে রোগঘ্ন, 'গ'-কার পাপঘ্ন এবং 'আ'-কার ভয়শত্রুঘ্ন। দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ, ভয় ও শত্রু হতে যিনি রক্ষা করেন, তিনিই দুর্গা। 'শব্দকল্পদ্রুম'-এ বর্ণিত আছে—

দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পরিকীর্ত্তিত।
উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মতঃ।।
রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ।
ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চাকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।।
স্মৃত্যুক্তিশ্রবণাদ্ যস্যা এতে নশ্যন্তি নিশ্চিতম্।
ততো দুর্গা হরেঃ শক্তির্হরিণা পরিকীর্ত্তিতা।।।
দুর্গেতি দৈত্যবচনোঽপ্যাকারো নাশবাচকঃ।
দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা বা প্রকীর্তিতা।।
বিপত্তিবাচকো দুর্গশ্চাকারো নাশবাচকঃ।
তং ননাশ পুরা তেন বুধৈর্দুর্গা প্রকীর্ত্তিতা।।

তাছাড়া বলা যায়, 'দুর্গ' শব্দটি দৈত্যবাচক এবং 'আ'-কার শব্দটি নাশবাচক। যিনি 'দুর্গ' নামক অসুরকে নাশ করেন তিনিই দুর্গা। এমনকী 'দুর্গ' শব্দটি বিপত্তিবাচক, 'আ-কার শব্দটি নাশবাচক অর্থাৎ বিপত্তারিণী দেবীই দুর্গা।

'স্কন্দপুরাণ' মতে রুরুদৈত্যের পুত্র দুর্গাসুরকে বধ করায় বিশ্বলোকে দেবী দুর্গা নামে অভিহিতা হয়েছেন। মহাদেবের নিয়োগক্রমে তিনি এই অসুরকে বধ করেছিলেন। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে দেবী স্বমুখে বলেছেন—

''তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।
দুর্গা দেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।।''

—অর্থাৎ দুর্গম নামক মহাসুরকে বিনাশ করে আমি প্রসিদ্ধা হব দুর্গাদেবী নামে। অন্যদিকে, যা দুঃখ বা দুর্গতি তাই দুর্গ; আর যিনি সর্ববিধ দুঃখ-দুর্গতি ও ভয় হরণ করেন তিনিই দুর্গা। ''দুর্গাসি দুর্গম ভবসাগর নৌবসঙ্গা।''

ব্যাকরণগত সূত্রে দুর্গা শব্দের অর্থ দাঁড়ায়— দেবীর তত্ত্ব অতি অগম্য বা দুর্জ্ঞেয় বলেই তিনি দুর্গা। দুর্ + গম্ (কর্মবাচ্যে) + ড (স্ত্রীলিঙ্গে) আপ্ প্রত্যয় যোগ করে পাওয়া যায় 'দুর্গা' শব্দটি।

শ্রীশ্রী চণ্ডীতে দেবী দুর্গা—শ্রীশ্রী চণ্ডীগ্রন্থে সাতশত মন্ত্র ও পাঁচশত আটাত্তরটি শ্লোক বিদ্যমান। এই সংখ্যক মন্ত্র থাকায় এই

গ্রন্থটি— 'সপ্তশতী চণ্ডী' নামে পরিচিত। এই গ্রন্থে দেবীতত্ত্বের সামগ্রিক রূপ ফুটে উঠেছে। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে দেবী নিত্যা। তিনি জগন্মূর্তি, সর্বব্যাপিনী, তথাপি দেবগণের কার্য সিদ্ধির জন্য তিনি আবির্ভূতা হন। তিনি অসুরশক্তির বিনাশ করে শুভশক্তির প্রকাশ ঘটান। তাই তিনি বলেছেন—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।। (শ্রীশ্রী চণ্ডী)

দেবী দুর্গা প্রভূতভাবে জগতের কল্যাণকারী তাই তিনি জগজ্জননী। ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষদান করেন বলেই তিনি সর্বকামার্থদায়িনী। তিনি বিশ্বলোকের অন্নদাতা, তাই তিনি অন্নদা। রুদ্রের ঘরনি বলেই তিনি রুদ্রাণী। শত অক্ষির দ্বারা বিশ্বচরাচরের সকল কিছু লক্ষ করেন বলেই তিনি শতাক্ষি। তিনি পরম বৈষ্ণব বলেই (তিনি) বৈষ্ণবী। অঙ্গকান্তি গৌরবর্ণাহেতু তিনি গৌরী। পর্বত দুহিতা তাই পার্বতী। দেবতা-মুনি-ঋষির আখ্যায়িকার তিনি বহুধা-বিশ্বরূপা। শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর অষ্টোত্তর শতনামে তাই বর্ণিত আছে—

''নারায়ণ নাম রাখে সর্ববিশ্বোদরী।
শুভকার্যে সকলেই কহে শুভঙ্করী।।
দেবলোকে নাম তব হইল উর্বশী।
আর এক রূপের নাম হইল ষোড়শী।।
শ্রীমন্ত নাম ছিল কল্যাণী কমলে।
গায়ত্রী নাম তব কহেন পাতালে।।''

■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

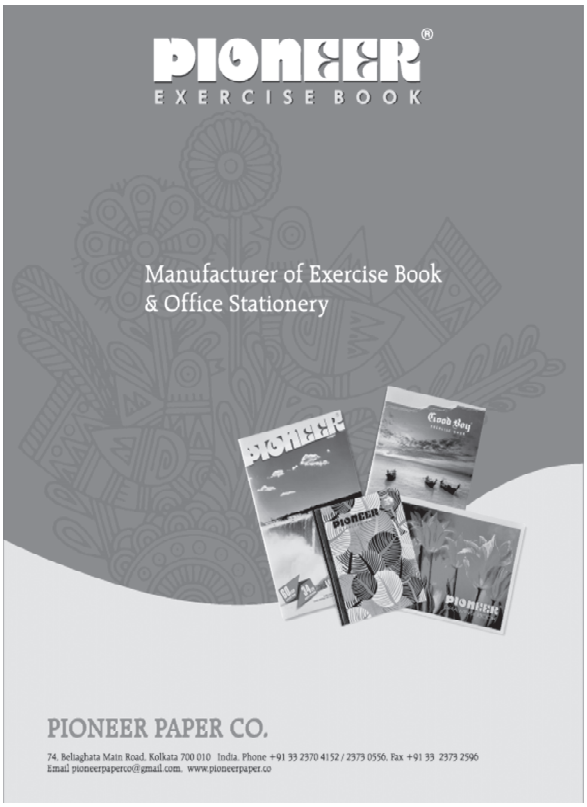

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

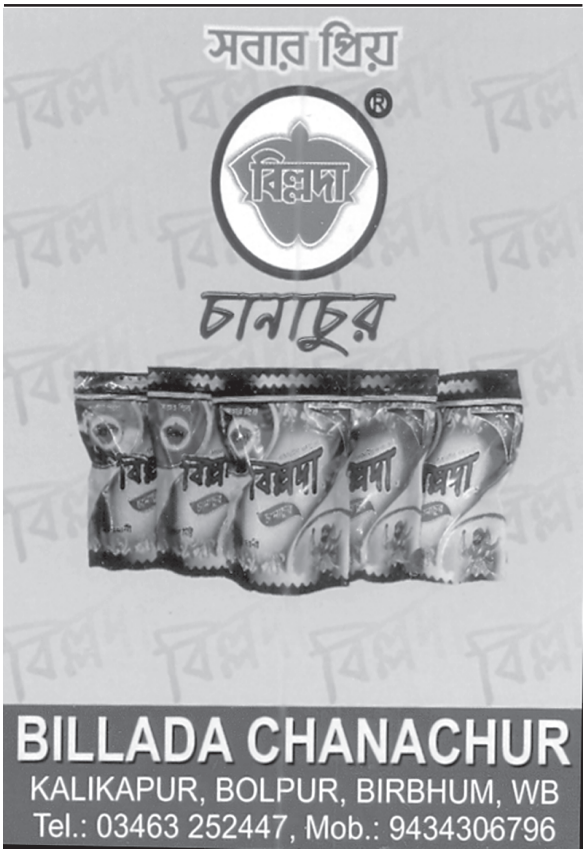

গতকালের কামিনীরা

জলজ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকদিন পরে আজ দেখলাম শর্মিলাদিকে।

সারাদিন ঝমঝম করে একঘেয়ে বৃষ্টি ঝরছে। মাঝে মাঝে থামছে, আবার হুড়মুড় করে সবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বাড়ি থেকে সারাদিন বেরোইনি। বেরোতে ইচ্ছে করছে না। বিকেলে একতলার ঘরে, জানলার ধারে বসে সিগারেট টানছি, দেখি, ভিজে সপ্‌সপে নীল শাড়ি পরে, নীল ছাতায় মাথা ঢেকে শর্মিলাদি আসছে। আমাকে দেখতে পেয়ে মুচকি হাসল। আমাদের পাড়ায় তার বাপের বাড়ি, হয়তো মা-র সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

শর্মিলাদিকে দেখলে মনে হয়, বয়স বোধহয় ৩৫/৩৬, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে, হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য মনে হলেও তার বয়স এখন ৫৮ চলছে। আমার থেকে অন্তত ১০ বছরের বড়। হুম্, হিসাব তো তাই-ই বলে। তবে আশ্চর্য ব্যাপার, এমন মেঘলা দিনে, এই নির্জন পাড়ায়, আর মুষলধারার বৃষ্টিতে, তাকে দেখতে দেখতে আমার শরীরে রোমাঞ্চ জাগল। সমস্ত দিনের অবসাদ, বিরক্তি আর অবহেলাকে মুহূর্তে মুছে দিল এক সবুজ রঙের অনাবিল আনন্দ। আরেকবার সিগারেট ধরিয়ে আমি ফিরে গেলাম গত শতকের সেই সত্তরের দশকে— আমার ছেলেবেলায়। দেখতে পেলাম, হারিয়ে যাওয়া সেদিনের এক উজ্জ্বল যুবতীকে। যে ঘুরে বেড়াত আমার চোখের চারপাশে, আর হয়তো ওড়াউড়ি করত মনের ভিতরেও ডানা মেলে।

উত্তর কলকাতায় যে পাড়ায় আমি জন্মেছি এবং আজও রয়ে গিয়েছি, তার নাম মোহিনীমোহন বড়াল স্ট্রিট। দেখতে গেলে, ইদানিং পাড়াটায় আদৌ আমূল পরিবর্তন হয়েছে, তা কিন্তু নয়। কয়েকটা পুরোনো বা জীর্ণ বাড়ি ভেঙে নতুন ফ্ল্যাটবাড়ি হয়েছে। কালের নিয়মে প্রাচীন পুরুষ ও নারীরা দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন। এবং আরও কিছু মানুষ-মানুষী পাড়া ছেড়ে সরে গিয়েছেন অন্যত্র। যথারীতি প্রতি বাড়িতেই রঙিন টিভি ও নতুন প্রজন্মের কানে মোবাইল চোখে পড়ে। পাড়ায় বাইক আর গাড়ির সংখ্যা বেড়েছে। অধিকন্তু উনিশ-কুড়ির মেয়েরা জিনস পরে সদর্পে হাঁটাহাঁটি করে। ব্যস এইটুকুই। অবশ্য আমার গল্প হলো, যেসব মেয়ে পাড়া ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে, তাদের নিয়েই। তারা আমার মাকে 'বউদি' বলত, সেই সম্পর্কে তারা আমার পিসিমাই হয়, অথচ আমি কেন যেন তাদের দিদিই বলতাম। এতে তারা খুশিই হতো।

ওইসব ঝলমলে পাখির মতো যুবতীদের মধ্যমণি ছিল শর্মিলাদি। তার জীবন তখন প্রাণবন্ত রঙিন ফানুস। বাস্তবিক, জীবনে তার নাটকীয়তার শেষ নেই। শর্মিলাদি পড়ত স্কটিশ চার্চ কলেজে। তার রোল মডেল ছিল কলকাতা কাঁপানো তিন মহিলা— কেয়া চক্রবর্তী, অপর্ণা সেন ও শ্রাবন্তী মজুমদার। ফর্সা, লম্বা, রোগা দোহারায় মুখ তার ঝকঝকে ধারালো। সুরেলা গলায় ভালো গান গাইতে পারত। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে শর্মিলাদি। ভাড়া বাড়িতে দোতলায় একটামাত্র ঘর নিয়ে থাকত ওরা। বাবা-মা আর চার ভাই-বোনের সংসার চলত ক্র্যাচে ভর দিয়ে। তবে শর্মিলাদি ছিল পাড়ায় অন্য মেয়েদের তুলনায় আলাদা এবং

অবশ্যই সেরা। যদিও সে অপরাপর মেয়েদের সঙ্গে মিশে যেতে পারত সহজে।

এখন মনে পড়ছে, সম্ভবত চারটে গুণের কারণে তার আবেদন বা আকর্ষণ ছিল পুরুষের কাছে অপ্রতিরোধ্য। যেমন, সাহস, আবেগ, কালচার আর বারবার প্রেমে পড়ার বাতিক। হঠাৎ রেগে যেত, আচমকা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলত, আবার সহসা কোনও প্রসঙ্গে সশব্দে হেসে পাড়া মাতাতো। পক্ষান্তরে, শর্মিলাদি ছিল আমার মায়ের খুব অনুগত। মায়ের ছিল শাড়ি কেনার তুমুল নেশা। কত যে হরেক রকম শাড়ি দেখেছি মায়ের পরনে, তার ইয়ত্তা নেই। অধিকাংশ দিনই মায়ের শাড়ি পরে কলেজে যেত শর্মিলাদি, বেড়াতেও যেত। মাকে 'বউদি' বলত সে। যত মনের কথা, প্রেমের সংবেগ-আশনাই মাকে না বলে থাকতে পারত না সে। একবার বড়দিনের বেলবটস আর টি-শার্টের ওপরে জ্যাকেট পরে ডায়মন্ডহারবার না ব্যান্ডেল চার্চ— কোথায় যেন পিকনিক করতে গেল সে বন্ধুদের সঙ্গে। পাড়া দিয়ে সে যখন চোখে সুচিত্রা সেনের 'আলো আমার আলো' সানগ্লাস লাগিয়ে আর মাথায় 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ' ছবির জিনাত আমনের মতো টুপি বাগিয়ে উত্তর কলকাতার রক্ষণশীল মূল্যবোধের সতীত্ব নাশ করে, হরিণীর মতো চঞ্চল পদক্ষেপে হেঁটে যাচ্ছে, তখন প্রবীণরা তো হতবাক আর মহিলাদের চোখ কপালে উঠে গিয়েছে। উপরন্তু পাড়ার ছেলেরা বিভিন্ন ভঙ্গিমায় স্ট্যাচু।

তো, এহেন শর্মিলাদি প্রথম প্রেমে পড়ে ফ্রকপরা বয়সে। পাশের পাড়ার কালো, লম্বা, রোগা অনিমেষদাকে ঘোড়ার মতো তেজি ও পৌরুষদৃপ্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে এ-পাড়া দিয়ে হেঁটে যেতে দেখতাম। পরনে সাদা টেরিলিনের শার্ট ও কালো গ্যাবার্ডিনের ট্রাউজার। কখনও পাতলুন ও ঢিলে পাঞ্জাবি। তাঁর সঙ্গে কেন-কীভাবে-কে জানে, শর্মিলাদির 'প্রেম' হয়ে গেল। বেশ কিছুদিন প্যার-মুহব্বত চলল দুজনের। মেট্রো বা গ্লোবে একটার পর একটা ইংরেজি সিনেমা দেখত তারা আর প্রতি রোববার দুপুরে রেডিওতে 'বোরোলিনের সংসার' শেষ হলেই মায়ের কাছে এসে, হেসে হেসে নিজের প্রেমকথা শোনাত শর্মিলাদি। তারপর কী হলো, বছরখানেক পরে এক রবিবারের বিষাদ-বিকেলে দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ধারে অনিমেষদার সঙ্গে বসে, কথা বলতে বলতে শর্মিলাদির সহসা মনে হলো, জীবনটা কেমন পানসে লাগছে, মন যেন তেঁতো হয়ে যাচ্ছে। দিনরাত যেন একইরকম। কোথাও কোনও খেলা নেই; মজা নেই; রহস্য নেই। আর ভালো লাগছে না অমিমেষকে। ক্রমে একঘেয়েমির বাতাবরণ গ্রাস করতেই সে দয়িতকে কোনও কিছু না জানিয়ে, স্বভাবতই সরে এল তার কাছ থেকে। মাসখানেক পর পুনরায় প্রেমে পড়ল এলাকার মস্তান বিরজুর। ওদিকে অনিমেষদা তো নায়িকাকে ছাড়তেই চায় না, তাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করে বসে আছে সে। শর্মিলাদিকে দেখতে পেলেই অনুনয়-বিনয় করে। হাত ধরে মিনতি জানায়। আমার মা-ও বলত, শর্মিলা, সবাই জানে অনিমেষ কত ভালো ছেলে, কেন তুই ওকে ছাড়লি? বিরক্ত হয়ে শর্মিলাদি বলত, ও আপনি বুঝবেন না বউদি। ওকে আর আমার ভালো লাগছে না। এত ভদ্র এত বিনয়ী ছেলে অনিমেষ, ওকে কেমন নিষ্প্রাণ, নির্জীব মনে হয় আমার। আর প্রচণ্ড সন্দেহবাতিক, আমার কি কোনও স্বাধীনতা নেই, বলুন তো! সবসময় ওকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকব নাকি!

অবশেষে অনিমেষদাকে নিজের রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলার এক অদ্ভুত মতলব আঁটলো শর্মিলাদি। সে একদিন রাত দশটা নাগাদ, পাশের পাড়া থেকে বেচারি প্রাক্তন প্রণয়ীকে কী একটা অজুহাতে ডেকে নিয়ে এল প্রায়ান্ধকার গলিতে। সেখানে অপেক্ষমাণ বিরজু। শর্মিলাদির সঙ্গে অনিমেষদা গলিতে ঢুকতেই, বিরজু কোনও ভূমিকা না করে, সপাটে সোডার বোতল মেরে মাথা ফাটাল প্রতিদ্বন্দ্বীর। প্রথমবার মানসিক আঘাতের পর, দ্বিতীয়বার শারীরিক আঘাতে বিপর্যস্ত অনিমেষদা সরে যেতে বাধ্য হলো প্রণয়িনীর জীবন থেকে। যদিও তার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে রয়ে গেল প্রেমিকার নাছোড় অস্তিত্ব।

শর্মিলাদি বোধহয় প্রেমের মধ্যে সর্বদাই বৈচিত্র্য খুঁজত। হয়তো তার কাছে যাপনকে ভোগ করার বা ভালোবাসার ওটাই শ্রেষ্ঠ উপায়। ফলে বিরজুও একসময় ক্লান্ত করল তাকে। বিরজুর মতো রকবাজ অশালীন যুবকের কাছ থেকে শর্মিলাদির মতো কালচার্ড মেয়ে আর কতটাই বা প্রেমের ঐশ্বর্য আশা করতে পারে। তবে বিরজুর কাছ থেকে সরে আসাও অত সহজ নয়। বিরজু তো আর অনিমেষ না। প্রায় ৬ ফুট লম্বা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বিরজুর চেহারা ব্যায়ামপুষ্ট, তার বেলবটসের পকেটে সবসময় চপার থাকে। যখন-তখন, যেখানে- সেখানে, যার-তার মুখে বা শরীরে ক্ষুর চালাতে পারে। অধিকন্তু রেগে গেলে, হিন্দি ফিল্মের ধর্মেন্দ্রর স্টাইলে সংলাপ বলে। অবশ্য শর্মিলাদিও নিতান্ত লাজুকলতা অবলা নারী নয়। একবার সিদ্ধান্ত নিলে সে কিছুতেই পিছু হটবে না। অতএব সে মুখে কিছু না বলে যথারীতি বিরজুকে এড়িয়ে চলতে থাকল। এতে বোধহয় বিরজুর ভোঁতা পৌরুষে ঘা লাগল। একদিল হলো কী, বর্ষার বিকেলে প্রচুর বাংলা মদ খেয়ে শর্মিলাদির বাড়ির সামনে এসে, গলা চড়িয়ে 'অ্যাই শর্মি', 'অ্যাই শর্মি' বলে চেঁচাতে শুরু করল। সেই চিৎকারে ভাড়াটে বাড়ির জানলা-দরজার পর্দা সরিয়ে কিছু সচকিত কৌতূহলী মুখ উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। পাড়াতেও কেউ কেউ ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে পড়ল। এদিকে, বেপরোয়া বিরজু তো দোতলার দিকে মুখ তুলে সমানে চেঁচিয়ে চলেছে। ওদিকে, হঠাৎ দেখা গেল বারান্দায় 'সীতা ঔর গীতা' সিনেমার হেমা মালিনীর মতো বদলা নেওয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে শর্মিলাদি— হাতে হরিণঘাটার দুধের খালি বোতল। নিমেষে বিরজুর মাথা তাক করে সবেগে কাচের বোতলটা ছুঁড়ল শর্মিলাদি। দারুণ টিপ। মাথায় সশব্দে বোতল পড়তেই, দু-হাতে মাথা ধরে রাস্তায় বসে পড়ল বিরজু। রক্তে ভাসছে মুখ। দর্শকরা হতভম্ব। ততক্ষণে শর্মিলাদি অদৃশ্য। তারপর আর ভুলেও নাকি কোনওদিন শর্মিলাদির দিকে চেয়েও দ্যাখেনি বিরজু।

মুক্তি পেল শর্মিলাদি— যদিও প্রেমের অমোঘ হাতছানি থেকে নয়। যথারীতি আবার প্রেমে পড়ল সে। কোমরে আঁচল জড়িয়ে, লজ্জাবনত আরক্তিম মুখে রান্নাঘরে মায়ের কাছে এসে, মায়ের পাশে পা ছড়িয়ে বসে বলল, জানেন তো বউদি, আমি না আবার প্রেমে পড়েছি। ওই আমার মাসতুতো দাদার বিয়েতে গিয়েছিলাম না শোভাবাজারে— ওই বিয়েরবাড়িতেই আলাপ— নাম পার্থপ্রতিম, নামটা সুন্দর না?

শুধু পার্থপ্রতিম কেন, এর পর অমল-বিমল-কমল বা রাম- শ্যাম-যদু ইত্যাকার পুরুষেরাও এল তার চলিষ্ণু যাপনে। তাদের হরেকরকম রূপ, স্বভাব আর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কত না গল্প তাদের ঘিরে এবং শর্মিলাদির 'যাবতীয় ভালোবাসাবাসি' কেন্দ্র করে। শর্মিলাদি মায়ের কাছে সেইসব গপ্পোগুজব করত আর আমি আড়াল থেকে সাগ্রহে শুনতাম। শুনতে শুনতে কখন আবিষ্ট হয়ে আমিই হয়ে যেতাম তার একনিষ্ঠ প্রেমিক। কেমন শিহরণ জাগত শরীরে। ভাবতাম, বড় হয়ে ঠিক শর্মিলাদির সঙ্গে প্রেম করবই।

ক্রমে অফুরন্ত প্রেম আর প্রেমিকের পালাবদলের মধ্যে দিয়ে কেটে

গেল শর্মিলাদির জীবনের দশটা বছর। অভিজ্ঞতা ও বয়সের সঙ্গে বোধহয় অনেকটা পরিণতও হলো শর্মিলাদি। সে যখন পূর্ণ যুবতী, আমি তখন সদ্য কৈশোর ছেড়েছি। সেই সময়—

একদিন রাত্রে শর্মিলাদি এল মায়ের কাছে। তার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। বস্তুত, তাকে ঘিরে তখন 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য'। এসে, মায়ের পাশে গায়ে আঁচল জড়িয়ে, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে উবু হয়ে বসল। প্রথমে কিছু বলল না। অবনত চোখে আঁচল আঙুলে জড়িয়ে খেলতে লাগল। মা তোলা উনুনে রুটি করছে। তাওয়ায় রুটি দিয়ে ওলটাতে ওলটাতে বলল, তোর কী হয়েছে রে? এত চুপচাপ কেন?

শর্মিলাদি মুখ তুলল। চোখে জল। উত্তেজনা প্রশমিত করে, কোনওক্রমে চাপা স্বরে বলল, আজ একটা ঘটনা ঘটেছে। মা অবাক হয়ে তাকাল। চোখের জল মুছে শর্মিলাদি বলল, আজ বিকেলে বউবাজারে অনুরাধাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ফেরার সময় বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছি। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। হঠাৎ দেখি, একটা ট্যাক্সি এসে থামল। ভিতরে দেখি, বসে রয়েছে ওই আপনাদের অনিমেষ। আমাকে ডাকল, শর্মিলা, তুমি কি বাড়ি ফিরবে, তাহলে চলে এসো।... আমি ট্যাক্সিতে উঠব কী উঠব না, ভাবছি, আবার দেখলাম, হাত নেড়ে ডাকছে। আশেপাশের লোকজন দেখছে, কী করব, উঠেই পড়লাম।...

চুপচাপ গাড়িতে বসে আছি, ওর পাশে। ও-ও কোনও কথা বলছে না। ভাবুন, কীরকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। তারপর কলেজ স্ট্রিটের ক্রসিংয়ে প্রচণ্ড জ্যাম। সেখানে কিছুক্ষণ গাড়ি আটকে রইল। আচমকা ও বলল, তুমি কেমন আছো শর্মিলা?... বিশ্বাস করুন বউদি, ওই একটা কথাতেই আমার কেমন যেন হয়ে গেল। আমি সামনের দিকে চেয়েছিলাম, ওর দিকে একবার তাকিয়েই আবার মুখ ফিরিয়ে মাথা নাড়লাম— ভালো আছি! ব্যস, আর কোনও কথা হলো না। হাতিবাগানে ট্যাক্সি থেকে নামলাম দুজনে। ভাড়া মিটিয়ে ও আমার দিকে তাকাল কেমন একটা চোখে, মানে—মানে— সেই দৃষ্টিটা— আপনাকে ঠিক আমি বোঝাতে পারব না— আমি শুধু বললাম, আমি যাচ্ছি—

তারপর—

পোল্যান্ডের বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার রোমান পোলানস্কি যখন 'রিপালশন' ছবিটা তৈরি করছিলেন, তখন নায়িকা খুঁজতে খুঁজতে বলেছিলেন, 'আমি এমন একটা মেয়ে চাই, যে কিনা দেখতে অপ্সরার মতো অথচ প্রেমিকের গলাটা ব্লেড দিয়ে অনায়াসে কেটে দিতে পারে।' অবশেষে তিনি তাঁর মনের মতো নায়িকা রূপে খুঁজে পান ক্যাথরিন দেনুবকে। কিন্তু শর্মিলাদি তো ক্যাথরিন দেনুব হতে পারল না, সুতরাং তাকে বিমল রায়ের পরিচালনায় (জরাসন্ধর কাহিনি অবলম্বনে) 'বন্দিনী' ছবির নায়িকা নতুনের মতো চিরাচরিত জীবনেই ফিরে যেতে হলো।

তারপর অর্থাৎ উপরোক্ত ঘটনার মাত্র পাঁচ মাস বাদেই অনিমেষদার সঙ্গে শর্মিলাদির শুভবিবাহ হয়ে গেল। আর বিয়ের পর শ্বশুরের বন্ধুর দৌলতে একটা সরকারি চাকরিও পেয়ে গেল শর্মিলাদি।

শর্মিলাদির পর পরমাদির কথা বলি। পরমাদি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে পড়ত। তাকে দেখতে অনেকটা বাংলা সিনেমার সেদিনের নায়িকা মিঠু মুখার্জির মতো— পাড়ার দিদি-বউদি-মাসিমারা অন্তত তেমনই দাবি করতেন। পরমাদির অ্যাফেয়ার ছিল তার থেকে বারো বছরের বড় সুবীরকিশোর নামে এক যুবকের সঙ্গে, যাকে আমি দেখিনি। কেন, কে জানে, সুবীরকিশোর একদিন পরমাদির জীবন থেকে সরে গেল। পরমাদি রীতিমতো মুষড়ে পড়ল। সর্বদা বিষণ্ণ থাকে, যেন জীবনের ভার আর সামলাতে পারছে না। বছরখানেক এমনভাবে জ্বালাযন্ত্রণায় কাটানোর পর আচমকা তার জীবনে কালবৈশাখীর মতো এল সহপাঠী ও সমবয়সী পুলক। নিস্তেজ পরমাদি তার সঙ্গে প্রেম করবে না, অথচ পুলকও কিছুতেই ছাড়ার পাত্র নয়। নিরুপায় পরমাদি অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্লান্ত হৃদয়ে ও অবসাদগ্রস্ত শরীরে তার সঙ্গে ঘুরতে থাকল, বেড়াতে গেল এখানে-ওখানে। 'কিছু তো চাহিনি আমি; শুধু চেয়ে চেয়ে থাকি' ভঙ্গিতে ঘুরতে ঘুরতে পুলককে বোঝালো যে আমি তোমার নয়, কারুরই নয়, আমি এখন বিরহিণী রাই, আমি এখন শূন্য জীবন নিয়ে অন্ধকারের কালসমুদ্রে পাড়ি দেব। তবে পুলকও জবরদস্ত পুরুষ। একদিন শরতের নীল সন্ধ্যায় দেশবন্ধু পার্কে গিয়ে, ব্লেড দিয়ে নিজের হাত কেটে, সেই রক্ত পরমাদির সিঁথিতে লাগিয়ে দিয়ে পুলক বলল, তুমি আমাকে ভুলে যেতে পারো, কিন্তু এই রক্তের দাগ কখনও ভুলতে পারবে না। ব্যস, পরমাদি কাত্। এর পরেও কি সে নায়কের কাছে আত্মসমর্পণ না করে পারে?

আমাদের পাড়ায় যেসব মেয়েরা পত্রপত্রিকা, গল্প-উপন্যাস পড়ত, রবীন্দ্রসংগীত বা নজরুলগীতি শুনতো, কী গুনগুনিয়ে গাইত, তাদের তালিকায় অন্তত মধুমিতাদিকে রাখা যায় না। কারণ মধুমিতাদির বিনোদন সাহিত্য নয়, ছিল হিন্দি সিনেমা। ধর্মেন্দ্র ও হেমা মালিনী তার প্রিয় নায়ক-নায়িকা। মাঝে মধ্যে দলে পড়ে বাংলা ছবিও দেখতে সে, বিশেষ করে উত্তমকুমারের ছবি। একবার হাতিবাগানে মধুমিতাদির সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। পাড়ার অতসী কাকিমার সঙ্গে মিনার হল থেকে বেরুচ্ছে। আমাকে দেখেই বলল, সুবর্ণলতা দেখলাম, জানিস। একদম বাজে বই। একটা মেয়ে শুধু বড় বড় কথা বলছে আর জ্ঞান দিচ্ছে। বল তো, কাঁহাতক ভালো লাগে? এর পর আমার হাত ধরে বলল, চল তো, চা আর চানাচুর খাবো। মাথা এক্কেবারে ধরে গিয়েছে।

এই মধুমিতাদি তার বিধবা মাকে নিয়ে আমাদের পাড়ায় একটা মাঠকোঠা বাড়িতে ভাড়া থাকত। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ও দীর্ঘাঙ্গী মধুমিতাদির পাড়ায় একটা চালু নাম ছিল— 'মধুঘোড়া'। মধুমিতাদি ঘোড়ার মতো মাথা দুলিয়ে হাঁটতো বলে, পাড়ার মেয়েরা তার এমন মজার নামকরণ করেছিল। মধুমিতাদিও সেটা জানত, তবে এ ব্যাপারে কোনও প্রতিবাদ করত না। পাড়ার মহিলারা কানাকানি করত, মুধুমিতাদি আর তার মা নাকি 'বিজনেস' করে। কেউ কেউ দেখেছে, ঠিক দুপুরবেলায় নির্জন পাড়ায় মাড়োয়ারি শেঠদের গাড়ি এসে গলির মুখে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে শেঠজীরা নেমে, চিৎকার করে মধুমিতাদিকে ডাকে— 'আইয়ে মধুমিতাজী আইয়ে— বাগানবাড়িমে চলিয়ে'— এইরকম ভাষায়। তখন নাকি সেজেগুজে মধুমিতাদি আর তার মা বেরিয়ে এসে, শেঠদের সঙ্গে গাড়িতে উঠে পড়ে। আবার রাত বারোটার সময় দেখা যায়, মা ও মেয়ে মাতাল হয়ে গাড়ি থেকে নামছে। নেমে, দুজনে গলা জড়াজড়ি করে টলতে টলতে বাড়িতে ঢুকে পড়ে। ব্যাপারটা সত্যি না মিথ্যে, তা আমি বলতে পারব না, কেননা, সেই কৈশোরে মধুমিতাদিকে আমার 'পাশের বাড়ির দিদি' ছাড়া আর অন্য কিছুই মনে হতো না। তো, ওই 'খারাপ মেয়ে' মধুমিতাদি সত্তর দশকের শেষের দিকে সহসা তার মাকে নিয়ে, একদিন পাড়া ছেড়ে চলে গেল কোথায় যেন! পরে পাড়ার কোনও কোনও দাদা বলত, তাকে নাকি মাঝে মাঝে রাত দশটার সময় পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু আজ ৩০/৩৫ বছর পেরিয়ে গেল, আমি মধুমিতাদিকে কোথাও কোনওদিন আর চর্মচক্ষে দেখতে পেলাম না। ■

রূপমতীর ইচ্ছে

আজ ভারতের যে রাজ্যকে তামিলনাড়ু বলা হয় বহু শতাব্দী আগে তা অনেকগুলি ছোটো রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সেই রকমই এক রাজ্যের রাজকন্যার নাম ছিল রূপমতী। রূপমতীর মনটা আজ একদম ভালো নেই। রানিমা নিজের হাতে কাজু-কিশমিশ-পেস্তা দিয়ে পায়েস রান্না করে দিলেন, তবুও চোখ দিয়ে অনবরত জল গড়িয়ে পড়ছে। কী হলো রূপমতীর! রাজা-রানির একমাত্র কন্য রূপমতী। খবর পেয়ে রাজামশাই রাজসভা থেকে অন্দরমহলে চলে এলেন।

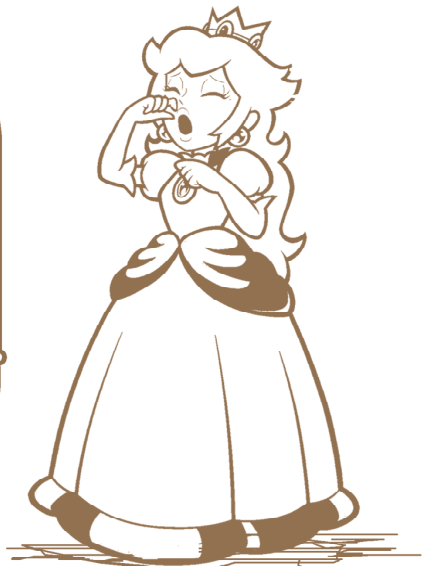

কন্যাকে কোলে নিয়ে রাজামশাই জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে বলতো আমার সোনার পুতুল মেয়ে? কী দুঃখ তোমার? সব দুঃখ আমি দূর করে দেব। —সত্যি বলছ? রূপমতী বলল। —সত্যি সত্যি সত্যি। তিন সত্যি করলাম, রাজামশাই বললেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে রাজকন্যে কোনওক্রমে বলল, ‘ মানুষ এত দুষ্টু কেন, কেন পশু শিকার করে? বাবা তোমার তির-ধনুকে কেউ যেন না মরে।’—ওহ্। এই ব্যাপার? আগে বললেই হতো। ঠিক আছে আমি ঘোষণা করে দিচ্ছি আজ থেকে আমাদের রাজ্যে আর কেউ যেন পশু শিকার না করে। রূপমতী খুব খুশি হলো।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। আবার একদিন রূপমতী রাজপ্রাসাদের ছাদে বসে কাঁদতে লাগল। রানিমা এসে কত জিজাসা করলেন, তবু মেয়ের কান্না থামে না। রাজার কানে এখবর পৌঁছে দেওয়া হলো। সেদিনকার মতো রাজসভা স্থগিত করে রাজামশাই রাজকন্যার কাছে এলেন। তাকে কোলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে আমার সোনার টুকরো মেয়ের? এত কান্না কেন? কী চাই তোমার? আমি সব পূরণ করে দেব। রূপমতী কোনও মতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, দাদা কী করেছে জানো? —না তো। কী করেছে সে? তোমার খেলনা ভেঙে দিয়েছে? রাজামশাই বললেন। —না না , তাহলে তো বলতাম। আরও খারাপ কাজ করেছে, বলল রূপমতী। —কী করেছে আমায় বলো,বললেন রাজামশাই দাদা একটা সুন্দর টিয়াপাখিকে বন থেকে ধরে নিয়ে এসে পায়ে শিকল পরিয়ে খাঁচায় বন্দি করে রেখেছে। বনের পাখি তো বনেই মানায়, তাই না বাবা? বন্দি পাখিটার কান্না আমি সহ্য করতে পারছি না বাবা। তুমি ওকে মুক্ত করে দাও, কাঁদতে কাঁদতে বলল রাজকন্যে।

রাজকুমারকে পাখিটাকে মুক্ত করে দিতে বলা হলো। কিন্তু রাজকুমার কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। বলল, পাখিটা কয়েকদিন কেঁদে কেঁদে ঠিক হয়ে যাবে। রাজামশাই পড়লেন মহাবিপদে। কার কথা রাখবেন, রাজকন্যা না রাজপুত্রের? এরকম অবস্থায় রাজা রানিকে বললেন, কী করা যায় বলো তো? রানিমা বললেন , এখন মেয়েকে কথা দাও যে টিয়াপাখিটাকে তুমি ছেড়ে দেবে। শুনে তো রাজকুমার রেগে টং।

রাজা-রানি দুজনেই চিন্তায় পড়লেন। রাত্রিবেলা রানিমা রাজামশাইকে বললেন, একটি বুদ্ধি মাথায় এসেছে। এতে দুজনেরই মনটা শান্ত হবে। রাত্রিবেলা যখন দুজনেই ঘুমুবে তখন পাখিটার শিকল খুলে খাঁচা থেকে বের করে বাগানে ছেড়ে দেবে। পাখি উড়ে বনে গেলে রূপমতী খুশি হবে আর শিকল কেটে উড়ে গেছে শুনলে রাজকুমারও শান্ত হবে।

শুনে রাজামশাই বললেন, বাহ্ তোমার তো দারুণ বুদ্ধি রানি।

সেই মতোই সব হলো। রাজকন্যা আর রাজপুত্র দু'জনই শান্ত হলো। রাজামশাই সারা রাজ্যে ঘোষণা করে দিলেন, এখন থেকে কেউ আর কোনও পশু-পাখিকে বাড়িতে বন্দি করে রাখতে পারবে না। তাদের স্বাধীনভাবে থাকতে দিতে হবে। রাজ্যের মানুষ সবাই তা মেনে নিল। আর এই খবরে রূপমতী খুবই খুশি হলো। তার সব ইচ্ছা পূরণ হয়েছে।

আকাশ দেববর্মণ

ভারতের পথে পথে

মহাবলীপুরম্

সাত প্যাগোডার শহর তামিলনাড়ুর মহাবলীপুরম্। বর্তমান নাম মামাল্লাপুরম্। জনশ্রুতি, বামনাবতারে বিষ্ণু যে বলীরাজাকে জয় করেছিলেন তাঁর নামানুসারে মহাবলীপুরম্ নাম হয়েছে। অন্য মতে, পল্লবরাজ নরসিংহ বর্মন ১ম ছিলেন মহামল্ল। মহামল্ল থেকে মহামল্লপুরম্ বা মামাল্লাপুরম্। পাহাড় কেটে গড়া ১০ টি গুহামন্দির রয়েছে। রয়েছে দ্রাবিড়ীয় মন্দিরশৈলীর ত্রিস্তর গোপুরম্, বৌদ্ধবিহারের আদলে গড়া মনোলিথিক পঞ্চপাণ্ডবের রথ। সাত প্যাগোডার শহর হলেও বর্তমানে একটি রয়েছে। বাকিগুলি সমুদ্র গ্রাস করেছে। রয়েছে ১০ টি মণ্ডপম্, মহিষাসুর মণ্ডপম্ সহ বহু গুহামন্দির। পল্লব রাজাদের অপূর্ব শিল্পসৃষ্টি দেশ-দেশান্তর থেকে পর্যটক আকর্ষণ করে চলেছে।

জানো কি?

ছদ্মনাম

- বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়—বনফুল।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ভানুসিংহ।
- প্রমথনাথ চৌধুরী—বীরবল।
- প্রমথনাথ বিশী—প্র.না.বি.।
- অখিল নিয়ে—স্বপনবুড়ো।
- মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়—শঙ্কর।
- সৈয়দ মুস্তবা আলি—সত্যপীর
- বিনয় ঘোষ—কালপেঁচা
- অন্নদাশঙ্কর রায়—লীলাময় বসু।

ভালো কথা

ঠাকুমার কুকুর ছানা

আমাদের নারকেল গাছের গোড়ায় কোথাকার একটা কুকুর চারটে বাচ্চা দিয়েছে। আমি জানতাম না। সেদিন দুপুরবেলা ঠাকুমা একটা বস্তা চুপি চুপি নারকেল গাছের গোড়ায় রেখে এল। বিকেলে কুঁই কুঁই শব্দ শুনে গিয়ে দেখি বস্তার ওপর চারটে বাচ্চা মায়ের দুধ খাচ্ছে। আমাকে দেখে ল্যাজ নাড়াতে লাগল। আমি তখনি বাড়ি থেকে অনেকগুলো মুড়ি এনে দিলাম। উঠে এসে সব মুড়ি খেয়ে নিল আর আমার কাছে এসে ল্যাজ নাড়িয়ে আবার বাচ্চার কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ল। ঠাকুমা দেখতে পেয়ে বলল খুব ভালো করেছিস। দু'দিন পরে খুব বৃষ্টি। আমি বাচ্চাগুলোর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। একবার কানে এল কুকুরটার করুণস্বরে চিৎকার। দেখি, ঠাকুমা একটা ঝুড়িতে করে বাচ্চাগুলো এনে বাইরের ঘরের কোনায় চট পেতে রাখছে। কুকুরটি আনন্দে ঠাকুমার পায়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। আমাকে দেখে ঠাকুমা বলল এখানেই থাক। এই বর্ষায় ওরা কোথায় যাবে। মা বলল, ওগুলো তোর ঠাকুমার ছানা।

শ্রেয়া বসাক, অষ্টম শ্রেণী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ন চ লো ষ মে নি	(১) নী ন্দি ন ক ন জ
(২) ত আ গী ব ং হ	(২) ন জ স বে মা শ

১০ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) শপথগ্রহণ (২) লালনপালন

১০ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) হারমোনিয়াম (২) অটলবিহারী

উত্তরদাতার নাম

(১) রূপষা দেবনাথ, বিরাটি, কলকাতা-৪৯। (২) স্বরূপ কুমার নাথ, বসিরহাট,উঃ ২৪ পরগনা। (৩) সৌরিন কেশ, তুলসীডাঙ্গা, পূঃ বর্ধমান। (৪) শঙ্খশুভ্র দাশ, সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। অভিমন্যু।। ২৭

অভিমন্যুর রথের অশ্ববল্গা ছিন্ন করেন কর্ণ।

অভিমন্যুর ধনুটিও কর্ণ ভাঙ্গেন শরক্ষেপে।

অভিমন্যুর রথের অশ্ব ও সারথী দুই-ই নিহত হয়।

অভিমন্যু ভগ্ন রথ থেকে লাফিয়ে নেমে আসে।

জকোভিচ এবং সেরিনার অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত বছরটা ছিল রজার ফেডেরার, রাফায়েল নাদালের। দুই সুপার জিনিয়াস ফেডেরার ও নাদাল যেভাবে বিশ্ব টেনিসকে শাসন করেছিলেন গত বছর, তার তুলনা মেলা

ভার। আর এবছর যদিও প্রথম অর্ধে দুই মহারথী যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও ফরাসি ওপেন জিতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটানোর সম্ভাবনা তৈরি করেছিলেন কিন্তু মাঝপর্বে এসে নোভাক জকোভিচের দাপটে কিছুটা হলেও ম্লান দুজনে। এই প্রতিবেদন তৈরির সময় জকোভিচ বছরের শেষ গ্রান্ডস্লাম যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে সেমিফাইনালে উঠে গেছেন। আর নাদালও শেষ চারে। কিন্তু ফেডেরারকে অপ্রত্যাশিত ছুটি করিয়ে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার নবোদিত নক্ষত্র জন মিলম্যান। আর সেই দুরন্ত মিলম্যানকেই থামিয়ে দিয়েছেন অভিজ্ঞ তারকা নোভাক জ্যাকভিচ। অন্যদিকে সুপারমম সেরিনা উইলিয়ামস উইমবলডনের পর যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালে উঠেছেন। ফাইনালে জাপানি প্রতিযোগীর কাছে হেরে গেলেও তার প্রতিভাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। আর একটি গ্রান্ডস্লাম জিতলেই কিংবদন্তী মার্গারেট কোর্টের পাশে বসে পড়বেন। গত বছর মাতৃত্বের স্বাদ পেয়েছেন সেরিনা। প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন কন্যার জন্ম দিতে গিয়ে। তার কয়েক মাসের মধ্যেই কোর্টে ফিরে একের পর এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটিয়ে যাচ্ছেন।

সাম্প্রতিককালে ফেডেরার নাদাল ও অ্যান্ডিমারেকে নিয়ে উত্তাল হয়েছে টেনিস বিশ্ব। কয়েক বছর আগে ঠিক এরকমই জমজমাট প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল পিট সাম্প্রাস, আন্দ্রে আগাসি, গোবাল ইভানিসেভিচ, অ্যান্ডি রডিক, মারাট আফিন প্যাট্রিক রাফটার ও কার্লোস মোয়ার মধ্যে। যদিও বেশিরভাগ গ্রান্ডস্লাম জিতে নিয়েছিলেন সাম্প্রাস ও আগাসি। কিন্তু মাঝে-মধ্যেই এই দুজনের যাত্রাভঙ্গ করে দিতেন অন্য পাঁচ তারকা। আর ইদানীংকালে সাত-আট বছর ধরে চারটি গ্রান্ডস্লামেই দাপট সবচেয়ে বেশি ফেডেরারের। এযাবৎ ২০টি গ্রান্ডস্লাম জিতে গ্রেট অস্ট্রেলিয়ান রয় এমারসনের রেকর্ড ভেঙে পাহাড় চূড়ায় অবস্থান করছেন সুইজারল্যান্ডের সুপারম্যান। এর মধ্যেও নাদাল ও জকোভিচ যথাক্রমে ১৬ ও ১২টি করে গ্রান্ডস্লাম জিতে নিয়েছেন। আর অ্যান্ডিমারের দখলে আছে ৫টি গ্রান্ডস্লাম। এই ফ্যাব ফোর বছরের পর বছর ধরে যে উচ্চমাত্রিক টেনিস খেলে দুনিয়ার মনোরঞ্জন করে চলেছেন তা যেন সুন্দর জীবনেরই জয়গান।

জ্যাকভিচ বছর খানেক আগেও ধরে নিয়েছিলেন তার পক্ষে চোট আঘাত কাটিয়ে তার স্বমহিমায় ফিরে আসা অসম্ভব। কিন্তু তার সাপোর্ট স্টাফরা আস্থা ও ধৈর্য হারাননি। অনির্বচনীয় মনের জোর ও পরিশ্রম করে তাকে কোর্টে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন এমনকী উইমবলডন চ্যাম্পিয়ন পর্যন্ত করে দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জকোভিচ ও তার কোচ, ট্রেনার, ডাক্তার, ফিজিও ও নিউট্রিশনিস্ট মিলে তার জন্য ডায়েট তৈরি করেছেন তা আজ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা স্বীকৃতি দিয়েছে এই বলে যে এই সুষম ডায়েট শুধুমাত্র টেনিস খেলোয়াড়ই নয় সব মাধ্যমের অ্যাথলিট এমনকী সাধারণ মানুষ যদি মেনে চলেন তাহলে শরীরবৃত্তীয় পুষ্টি ও শক্তি অনেকটাই বেড়ে যাবে। এই সুষম খাদ্যগ্রহণ ও ট্রেনিংয়ে সামান্য পরিবর্তন এনে জকোভিচ অসাধ্যসাধন করেছেন। যে জকোভিচ একসময় হাত ও কাঁধের যন্ত্রণায় ঠিকমতো সার্ভিস করতে পারতেন না, সেই জকোভিচের ভয়ঙ্কর সার্ভ ও ডাউন দ্য লাইন ফোরহ্যান্ড রিটার্ন বিশ্বের সব জবরদস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে আতঙ্ক হয়ে উঠেছে। তার জলন্ত উদাহরণ উইমবলডনের ফাইনাল। যে দৈত্যকায় কেভিন অ্যান্ডারসন সেমিফাইনালে ফেডেরারকে জমি ধরিয়ে দিলেন, অ্যান্ডারসন কিনা ফাইনালে জকোভিচের জোরালো সার্ভ-ভলির কোনো উত্তরই খুঁজে পেলেন না। একইরকম ভাবে সদ্য সমাপ্ত যুক্তরাষ্ট্র ওপেনেও সেই গতিশীল ও শক্তিময় টেনিস খেলে জকোভিচ সব সংশয়ের জবাব দিয়ে দিয়েছেন।

আর সেরিনা উইলিয়ামসের কীর্তি তো কোনো বিশেষণে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এর আগে বহু অ্যাথলিট ও ক্রীড়াবিদ মা হওয়ার পর মাঠে, কোর্টে বা সাঁতারের পুলে ফিরে এসে ঝড় তুলেছেন। যেমন ইজরায়েলের রানার এসথাররথ, ব্যাডমিন্টনের সুসি সুশান্তি (ইন্দোনেশিয়া) নিজ নিজ বৃত্তে কীর্তিকল্প রচনা করেছেন। কিন্তু টেনিসের মতো অতীব কঠিন খেলায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের সাফল্য পাওয়া এক কথায় অসম্ভব। গতি, শক্তি, স্কিলের সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রয়োগ এই টেনিসে দেখা যায়। সেখানে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে, সন্তানকে ঠিকমতো দেখভাল করেও কোর্টে ফিরে এসে নিজেকে ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যেতে পেরেছেন সেরেনা। মা হওয়ার আগে তিনি ছিলেন বিশ্ব টেনিসের কিংবদন্তী, তার অসংখ্য গ্রান্ডস্লাম খেতাব জয়ের প্রেক্ষিতে। আর মা হওয়ার পরের সেরিনা যেন দুনিয়ার সব মায়ের কাছে প্রেরণা ও উদ্দীপনার আলোকস্তম্ভ স্বরূপ। এই সময়ের বিশ্ববাসী ভাগ্যবান যে তারা সভ্যতার ইতিহাসে দুই সুপারম্যান ও সুপার উওম্যানকে চোখের সামনে একের পর এক অসাধারণ অবিশ্বাস্য কীর্তি ও গরিমায় আলোকিত হতে দেখলেন। যতদিন এই সভ্যতা ও সমাজ বেঁচে থাকবে, ততদিন রজার ফেডেরার ও সেরিনা উইলিয়ামস মহীরুহ হয়ে বিরাজ করবেন মানসলোকে। ■

মায়ের আত্মত্যাগ, মেয়ের গুরুদক্ষিণা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতীয় পরম্পরায় বাবা-মাকে মহাগুরুর আসন দেওয়া হয়েছে। অন্য কোনও গুরু তা তিনি শিক্ষাগুরু, অন্নগুরু বা কুলগুরু যাই হোন না কেন, মহাগুরুর সমকক্ষ হতে পারেন না। মহাগুরুদের মধ্যে কেউ, ধরা যাক মা, যদি তাঁর সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে স্বপ্ন দেখেন তাহলে যে কোনও সুসন্তান যে সর্বস্ব পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ত্রিপুরার ট্রেসি ডারলং এমনই এক সুসন্তান। কুড়ি বছরের মেয়ে। দেখলে মনে হবে রাজ্য তো অনেক দূরের ব্যাপার, সে বোধহয় গ্রামের বাইরেই কখনও পা দেয়নি। কিন্তু ঘটনা হলো, একাধিক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কিকবক্সিং প্রতিযোগিতায় ট্রেসি ডারলং একেবারে হুলুস্থুলু ফেলে দিয়েছে। একেবারে হাতেগরম সাফল্যটি এসেছে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে। যেখানে ট্রেসি শ্রীলঙ্কার প্রতিযোগীকে হারিয়ে সোনা জিতে সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে।

স্তম্ভিত হওয়ার কারণ আছে বই কী! যারা ওকে চেনেন, ছোটোবেলা থেকে দেখেছেন, ট্রেসির স্বর্ণপদকজয়ের খবর শুনে তাঁরা আনন্দ তো পাবেনই, কিন্তু পরক্ষণেই ওদের চোখের পাতা ভিজে যাবে। এই অশ্রু আনন্দেরই। কারণ যে অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে ট্রেসির এই উত্থান তার সমতুল্য দৃষ্টান্ত কেবল রূপকথায় মেলে।

ট্রেসির বাড়ি আগরতলা থেকে ১৪০ কিলোমিটার দূরে। জায়গাটার নাম ধলাই। এরকম একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিকবক্সিংয়ের মতো শহুরে খেলার কী পরিকাঠামো থাকতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। যাই হোক, মূল প্রসঙ্গে ফিরি। ট্রেসিদের বাড়িতে একমাত্র রোজগেরে ব্যক্তি ছিলেন তার বাবা। বছরখানেক আগে তিনি মারা যাওয়ার পর পরিবারটি আরও দুরবস্থার মধ্যে পড়ে।

ট্রেসির ছেলেবেলার গল্প বলতে গিয়ে তার মা বিকাভেলি দেবী জানিয়েছেন, ছোটোবেলা থেকেই ট্রেসির নানান খেলায় উৎসাহ। কবাডি, ভলিবল, ফুটবল— সবই সে খেলত। যখন যে নবম শ্রেণীর ছাত্রী তখন একদিন স্থানীয় প্রশিক্ষক পিনাকী চক্রবর্তী তাকে কিকবক্সিংয়ের কথা বলেন। একটি ইংরেজি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিকাভেলি দেবী বলেন, পিনাকী স্যার প্রায়ই আমাদের বাড়িতে এসে টেসিকে খেলাধুলোয় উৎসাহ দেওয়ার কথা বলতেন। কিকবক্সিংয়ে গেলে ট্রেসি নাকি খুব ভালো করবে, একথা ওঁর মুখেই প্রথম শুনি। কিন্তু আমাদের তো এই অবস্থা। ২০১৩ সালে সুযোগ পেলেও, টাকাপয়সার অভাবে ওকে কলকাতার জাতীয় প্রতিযোগিতায় পাঠাতে পারিনি। ২০১৪ সালেও বেঙ্গালুরুতে আবার সুযোগ পেল। সেবার অনেক কষ্ট করে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু মেয়ে সোনা জিতে আমার সব কষ্ট ভুলিয়ে দিয়েছিল।'

বিকাভেলি দেবী গ্রামের আশাদিদি। অর্থাৎ অ্যাক্রেডিয়েটেড সোশ্যাল হেলথ অ্যাকটিভিস্ট (আশা)। স্বামী মারা যাবার পর এটাই তাঁর রুজিরোজগার। কিন্তু এই কাজ করে মাসে হাজার টাকার বেশি রোজগার করা কী যে কঠিন, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। গ্রামের বেশিরভাগ মহিলাই বাড়িতে সন্তানের জন্ম দেন। দৈবাৎ কেউ যদি সরকারি হাসপাতালে যেতে রাজি হন তাহলে বিকাভেলির রোজগার সামান্য বাড়ে। কিন্তু তারও সীমা দু' হাজার টাকা। এর বেশি হয় না। এই অবস্থায় মেয়ে যদি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায় তাহলে মা কী করবেন? যুগ যুগ ধরে ভারতীয় মায়েরা যা করে এসেছেন তাই করেছেন বিকাভেলি। গয়না বিক্রি করে টাকা তুলে দিয়েছেন মেয়ের হাতে। সেই টাকা নিয়ে ট্রেসি পাড়ি দিয়েছেন চণ্ডীগড়। পরেরটা ইতিহাস।

ট্রেসি বলেন, 'আমার মা গয়না বিক্রি করে আমাকে চণ্ডীগড়ে পাঠিয়েছিলেন। সবাই এ সুযোগ পায় না। আমি পেয়েছি কেবলমাত্র আমার মায়ের জন্য।' এখনও পর্যন্ত ট্রেসি পাঁচবার স্বর্ণপদক জিতেছেন। ভবিষ্যতে আরও অনেক স্বর্ণপদক জিতবেন। গর্বিত করবেন মাকে এবং তার দেশকে। কিন্তু সব শেষে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। সন্তানকে সাফল্যের শিখরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আর কত মাকে গয়না বিক্রি করতে হবে? ত্রিপুরা রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক কি কথাটা একবার ভেবে দেখবেন? তা না হলে ট্রেসিরা কিন্তু অকালেই ঝরে যাবে। আগুনের ঘরে বাস করে সবার পক্ষে বৃষ্টির স্বপ্ন দেখা সম্ভব হবে না। ■

আমাদের গান্ধীবাবা, ওরেব্বাবা

মহাত্মা গান্ধী একজন পলিটিশিয়ান না হতে পারেন, ইকনোমিস্ট না হতে পারেন কিন্তু তার চাইতে তিনি ঢের বড়। তিনি হচ্ছেন মানুষ ও ভারতবর্ষে এ যুগে একমাত্র মানুষ।

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞাপিত, বিখ্যাত বামপন্থী ইতিহাসবিদ শ্রীরামচন্দ্র গুহ জিন্না সাহেবকে নিয়ে নিবন্ধ রচনার প্রাগ্‌ভাষে আমাদের গান্ধীবাবাকে নিয়ে কিছু যথার্থ বক্তব্য রেখেছেন। জাতির বাবাকে জড়িয়ে, সুতরাং, কষ্ট নয়, কৌতুকবোধই জাগল।

মোদ্দা কথা, সকল শ্রেণীর ভারতবাসীই তাঁকে অপছন্দ করেছে। প্রগতিশীলরা ভেবেছে প্রতিক্রিয়াশীল। হিন্দুত্ববাদীরা ভেবেছে তিনি মুসলমান-ঘেঁষা। আম্বেদকর সাহেবের শিষ্যদের ধারণায়, জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতায় আন্তরিক ছিলেন না তিনি। নারীবাদীরা ভেবেছেন, তাঁর লিঙ্গবৈষম্য বিরোধিতা নেহাতই ওপর-ওপর। আধুনিক মানুষ ভেবেছে তিনি অতীতচারী। অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল লোকজন ধরে নিয়েছেন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থকে তিনি অশ্রদ্ধা করতেন।

DEBT HOLIDAY
BY FRANCE FOR JU
Gandhi Freed by British as He Starts Fast in Jail
Government Feared Serious Disorders if Indian Leader Died in Prison—Ordeal Thought Likely to Prove Fatal to Mahatma.
Cabine
Truc
De
U.
Bri
By the United Press.
POONA, India, May 8.—The Mahatma Gandhi was released from prison by British authorities today at the start of his three weeks' fast.
almost emaciated leader of Indian nationalism fear, may not survive the fast, was set Yeravda Jail for refusing to

কথাগুলো তো খুব ভুল নয়! প্রচারমাধ্যমের ব্যাপক প্রসারের এই যুগে নতুন করে কত কী-ই তো জানা যাচ্ছে, ইতিহাসের নানান ঘটনাবলী দেখা হচ্ছে নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে। কৌতুকবোধ জাগল একরকম তুলনামূলক বিচারবোধ থেকেই। রাজনীতিবিদদের মধ্যে বোধহয় রসবোধ সর্বদা আশা করা যায় না, তাঁদের বলৎশক্তি ও চলৎশক্তি যতই থাকুক। ওদিকে কবি-সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে বলা যায়, কেজো ক্রমে হচ্ছে অকেজো পলিটিক্সের পাশ ঠেলে। হক কথা কয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, জাতির বাবাকে নিয়ে পুত্র-কন্যাদের দ্বন্দ্ব তাঁর নিজের কৈফিয়তেই আমরা জড়িয়ে দেখতে পারি। নর ভাবে, আমি নারী ঘেঁষা। নারী ভাবে, নারী বিদ্বেষী।... স্বরাজিরা ভাবে নারাজি, নারাজিরা ভাবে, তাদের অঙ্কুশই!

পড়ছিলাম প্রমথ চৌধুরীর কিছু কিছু অগ্রন্থিত গদ্য রচনা। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই দেশ, বিশেষত এই রাজ্যের সামাজিক-রাজনৈতিক নানান ব্যাপার-স্যাপার বেশ নতুনভাবে দেখা যায় তাঁর লেখাগুলো পড়তে পড়তে। যেন আজকেরই কাগজে কোনও উত্তর-সম্পাদকীয় পড়ছি, ভেবে নিতেই পারি! সুললিত, সুস্বাদু, গতিসমৃদ্ধ তাঁর চলিত ভাষা এবং বেশ অনেকগুলো ক্ষেত্রেই অবাক হয়ে দেখছি, কী অসম্ভব তাঁর দূরদৃষ্টি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পৃথিবীর হালচাল, হালকা চালে বলতে বলতেই তিনি যেন প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিচ্ছেন, বিষ দিয়ে বিষয়ের মতন আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে দুনিয়া এগোচ্ছে। খিলাফত আন্দোলন থেকে বিশ দশক শেষের আর্থিক মন্দা, ছেচল্লিশের দাঙ্গা থেকে ভবিষ্যৎ ভারতের চেহারা কেমন হতে পারে— চমৎকার পরিমিতিবোধে বলেছেন তিনি। দাঙ্গা-হাঙ্গামার তপ্ত সময়টায় অবশ্য প্রসন্নতার অভাব ঘটেছে তাঁর। 'বসুমতী' শারদীয়ার জন্য গল্প লেখার অনুরোধ পেয়ে তিনি জানাচ্ছেন, 'বর্তমানে আমার মন এতটা উত্তেজিত হয়ে রয়েছে যে, আজ যদি আমি কোনো গল্প লিখতে বসি, তা হলে তাতে খালি দুটি মাত্র রস থাকবে— তিতো ও ঝাল।... হিন্দু মুসলমানের পরস্পর বিরোধটা আমার মনের উপর বারো মাস একটা পাপের বোঝার মতো চেপে থাকে...আমার বিশ্বাস, সত্য কথা সব সময়ই বলা ভালো। আমরা কেবলমাত্র বুদ্ধিমান জীব নই— আমরা সবাই রক্তমাংসের দেহ ধারণ করি— অতএব আমরা সকলেই অল্পবিস্তর

রাগদ্বেষের বশীভূত এবং মানবজাতি অবহমান কাল তাই থাকবে।... কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোনও কোনও অবস্থায় আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে কথা যে অতি সতর্ক হয়ে বলা প্রয়োজন, তা আমি সম্পূর্ণ জানি। ...মিষ্টি করে মিছে কথা বলাও সম্পূর্ণ নিষ্ফল।'

যাই হোক, বেছে বেছে উপযোগী বাক্য উদ্ধারের কোনও মানে হয় না। প্রমথ চৌধুরীর মনোভাব বা সেই সময়কার পরিস্থিতি তিনি কীভাবে দেখেছেন, জানতে হলে তাঁকে সম্পূর্ণ করে পড়াই ভালো। দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিষ আজও মাথায় উঠতে চলেছে, সে নিয়ে প্রথম কত সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন বা প্রতিষেধক বাতলেছেন, তা নিয়ে বারান্তরে কথাবার্তা হতে পারে। সুরসিক মানুষ বলেই তো 'উল্টা বুঝিলি রাম' বাক্যটিকে তিনি 'উল্টা বুঝিলি রহিম' বলে দিতে পারেন! কিন্তু তাঁর লেখাজোখা ধার করে, ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে খিল্লি করতে চাইলে আজকালকার রসকষহীন আবহে আমাকে রামেও মারবে, রাবণেও মারবে।

জাতির বাবা জড়িয়ে কথা হচ্ছিল। স্বভাবসিদ্ধ স্বচ্ছ চোখে স্বরাজ্য নিয়েও প্রমথ লিখেছেন— সাহিত্য প্রসঙ্গেই ঘুরে গেছে কথা। ...গত পয়লা এপ্রিল আমাদের মাতৃভূমির স্বরাজ্য লাভ হয়েছে। কিন্তু বদলাটা যে কী হলো, সে বিষয়ে বিষম মতভেদ আছে।... বাংলা ভাষা আজও তার স্বরাজ্য লাভ করেনি। আর ভবিষ্যতে যে করবে তারও কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

কথায় কথায় নানান লেখায় গান্ধীবাবার ব্যাপার এসেছে অনেকবার, কিন্তু অন্যান্য প্রসঙ্গে যে সহজ পরিমিতিবোধ, ওই প্রসঙ্গে যেন সেটি নেই। কিছুটা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে গান্ধীজীকে দেখা হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর কীভাবে কতখানি ও কেন কালচিহ্নিত হয়ে রইলেন এক্ষেত্রে, তা নিয়ে যোগ্যজন গবেষণা করবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু এই আজকের দিনে, অর্থাৎ, রামচন্দ্র গুহকে পাঠ করার ক্ষণে এবং কোনও কোনও মহলে যথেচ্ছ প্রচারিত প্রতিষ্ঠিত কিছু কেচ্ছাকাহিনির বায়ুগ্রস্ত মননে, ওসব পড়ে আমার বেশ মজা লাগছে। কথাগুলো অনুধাবন যোগ্য :

'...মহাত্মা গান্ধী যখন চার বৎসর পূর্বে এ দেশে প্রথমে স্ব-রূপে আবির্ভূত হন, তখন আমরা কোনও শিক্ষিত লোকই তাঁকে ঠিক চিনতে পারিনি। আমরা নন-কো-অপারেটরই হই আর অ-নন কো-অপারেটরই হই, আমরা কেউই অন্তরের সঙ্গে তাঁর প্রস্তাবিত ভারত উদ্ধারের উপায়গুলি গ্রাহ্য করতে পারিনি। আমি যে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিনি তার কারণ— আমার জ্ঞান বুদ্ধিতে যত দূর কুলোয়, তাতে আমি তাঁর প্রচারিত পলিটিক্স ও ইকনোমিক্সকে পলিটিক্স ও ইকনোমিক্স বলে স্বীকার করতে পারিনি। চরকার গুণ ব্যাখ্যান করতে বসলে— আমি আগাগোড়া মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য হতাম। কিন্তু কারও কপট শিষ্য হওয়া আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাছাড়া আত্ম-প্রতারণাকে আমি ভয়ঙ্কর ডরাই। অপর পক্ষে তাঁর যে-সকল শিষ্য তাঁকে মহা পলিটিশিয়ান এবং মহা ইকনোমিস্ট বলে বিশ্বাস করতেন— তাঁরাও ঠিক চিনতে পারেননি। মহাপুরুষ কখনও মহাচালাক হয় না।...'

কী? খুব রহস্যময় সান্ধ্য ভাষা বলে বোধ হচ্ছে? রবিঠাকুর তুলে যা নিয়ে খিল্লি করা যায়, অচেনাকে চিনে চিনে উঠবে জীবন ভরে? কিন্তু কালাতিক্রমী হতে হতে প্রমথ কীভাবে কালাচিহ্নিত হয়ে গেলেন, পরবর্তী কিছু প্যারা থেকে সে কথা উদ্ধার করি :

'...মহাত্মা গান্ধী উপবাস ব্রত গ্রহণ করেছেন একথা শুনে আপামর সাধারণ সকলেই আশঙ্কিত ও ব্যথিত হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি সমগ্র ভারতবাসীর এই অসামান্য প্রীতি বাস্তবিকই একটি অলৌকিক ঘটনা। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মনের যে অংশ রেটিন্যাল সে অংশের উপর মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব তাদৃশ না থাকলেও আমাদের মনের যে-অংশ স্পিরিচুয়াল সে অংশের সঙ্গে তাঁর মনের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এর কারণ কী? মহাত্মা গান্ধী একজন পলিটিশিয়ান না হতে পারেন, ইকনোমিস্ট না হতে পারেন কিন্তু তার চাইতে তিনি ঢের বড়। তিনি হচ্ছেন মানুষ ও ভারতবর্ষে এ যুগে একমাত্র মানুষ।

তাঁর অভাবে ভারতবর্ষ নির্মনুষ্য হবে, তাই তাঁর জন্য আমাদের এত ভয়, এত ভাবনা। মহাত্মা আজ কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন? তিনি প্রায়শ্চিত্ত করছেন শিক্ষিত সমাজের কপটতা ও জনগণের হিংস্রতার জন্য। তিনি এ সত্য স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি যে, যে-অন্ধশক্তির তাণ্ডবলীলা আমাদের সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে, সে অন্ধশক্তি উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি নিজে দায়ী। আমরা যেমন তাঁকে চিনেও চিনতে পারিনি, তিনিও তেমনি আমাদের চিনতে পারেননি।...'

কথা উদ্ধার, এইখানেই থামিয়ে পাঠকের বিবেচনার জন্য সমস্ত সম্ভাবনার দিক খুলে রেখে দিলাম।

আজকের ভারতবর্ষে সেকু-মাকু প্রবণতা যেখানে ব্যঙ্গের বিষয়, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ওপর বোমাবর্ষণ হলে যে দুর্বোধ্য বাবামশাই বলেছিলেন তিনিই সবচেয়ে বেশি দুঃখ পাবেন, সমস্ত স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের গতি পেছন দিকে টেনে ধরতেন যে বাবা— তাঁরই সন্তানদের স্বাভাবিক গতি নয়? একটু অপভাষাই বরং বলি, রাজনীতির লোকদের থেকেই শোনা; অনশন হলো গিয়ে মাগ-ভাতারের ঝগড়া। আর হ্যাঁ, উদ্বাস্তু হয়ে যারা এসেছিল, তারা তো তেড়েফুঁড়ে চিল্লাবেই, জাতির বাবার কটা মুখ মশাই? মোক্ষম সময়ে মুখে সেলোটেপ লাগাতেন!

আমাদের চিন্তাভাবনায় স্বরাজ্য আসুক। ইতিহাসকে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হোক। আর এইসব লিখাজোখার আড়ালে রাম-রাবণ কী শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াইতো চিরন্তন। বুঝ লোক যে জানো সন্ধান! ■

মিন্টু (প্রয়াত রাধাগোবিন্দ পোদ্দার) আমাদের হারিয়ে দিয়েছে

প্রদীপ ঘোষ

সময়টা ১৯৫৮ সাল। আমরা বাংলা থেকে ছ' জন তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে যোগ দিতে নাগপুর গিয়েছিলাম। আমরা কলকাতা থেকে তিনজন এবং বাইরে থেকে তিনজন। তখন বর্গ তিরিশ দিনের হতো। বর্গ শেষ হবার মাত্র কয়েকদিন আগে আমার বাবা পরলোকগমন করেন। তিনি বেশ কিছুদিন পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী ছিলেন। আমার দাদারা ভাবলেন যে, মৃত্যুসংবাদ পেয়ে হয়তো আমি ভেঙ্গে পড়ব। তাই তাঁরা আমাকে জানালেন যে বাবার শরীর খুব খারাপ, বর্গ শেষ হবার পরে অন্য কোথাও বেড়াতে না গিয়ে যেন সোজা বাড়ি ফিরি। সেই দিনই মিন্টুর চিঠি পেলাম। মিন্টু রাধাগোবিন্দ পোদ্দারের ডাকনাম। ও লিখেছিল, 'আপনার শোকে সমবেদনা জানাচ্ছি।' আমার তো পুরো বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গেল।

রাধাগোবিন্দ পোদ্দার ওরফে মিন্টুর জন্ম তাদের আদি নিবাস তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা জেলার লৌহজংয়ে। দেশভাগের পরে উদ্বাস্তু হয়ে ছাত্রাবস্থায় পরিবারের সবার সঙ্গে সে ভারতে চলে আসে এবং পূর্ব কলকাতার উল্টোডাঙ্গায় আশ্রয় নেয়। পরবর্তীকালে ওদের পরিবার বেলেঘাটার ১নং চাউলপট্টি রোডে বাড়ি কিনে চলে যায়। সেই সময় উল্টোডাঙ্গা শাখার বেশ কয়েকজন নতুন স্বয়ংসেবক ছিলেন পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তু। এঁদের মধ্যে একজন হলেন রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বতন ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক। এঁরাও পরবর্তীকালে টালিগঞ্জে বাড়ি করে চলে যান। কলকাতায় আসার পরেই মিন্টু উল্টোডাঙ্গা শাখায় আসতে শুরু করে। ও আমার চেয়ে বয়সে কিছুটা ছোট ছিল। সেই সময়ে ও উল্টোডাঙ্গা শাখার তরুণ গণশিক্ষক, আমি মুখ্যশিক্ষক এবং সুজিত ধর (তখন ডাক্তারির ছাত্র) কার্যবাহ। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র তাকে গোবিন্দদা বলেই ডাকা হতো। কিন্তু কলকাতায় ও মিন্টু নামেই পরিচিত ছিল। একবার কলকাতার একজন স্বয়ংসেবক মালদহের কালিয়াচকের বালিয়াডাঙ্গায় গিয়ে কয়েকজন স্বযংসেবকের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁদের কাছে মিন্টুদার খোঁজ নেন। তাঁরা বললেন যে, ওই নামে তাঁরা কাউকে চেনেন না, যদিও মিন্টু তখন মালদহ বিভাগ প্রচারক। আমাদের মালদার বাড়িতে মিন্টু অনেকবার এসেছিল। কখনো সঙ্ঘের কার্যক্রমে, কখনো এমনি দেখা করতে। একবার বেল বাজতে জিজ্ঞেস করলাম, কে? জবাবে ও বলল, 'আমি মিন্টু'। 'আমি গোবিন্দ' বলেনি।

উল্টোডাঙ্গা শাখা এবং মিন্টুর অনেক কথাই স্মৃতিতে ভিড় করে আসে। ও খুবই উৎসাহী প্রকৃতির এবং সরল স্বভাবের ছিল। তখন উল্টোডাঙ্গা শাখার স্বয়ংসেবকেরা প্রতি বছর সরস্বতী পুজো করত এবং সেই উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক কার্যক্রম হতো বেশ ধুমধাম করে। সঙ্গে জলযোগ। একবার সাংস্কৃতিক কার্যক্রম শুরু হতে কোনও কারণে বিলম্ব হচ্ছে। সকলে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছেন। হঠাৎ মিন্টু গিয়ে সুজিতদাকে বলল, ''সুজিতদা, শিশু স্বয়ংসেবকরা ঘুমিয়ে পড়ছে। ওদের আগে খাইয়ে দেব।'' তারপর কার্যক্রম শুরু হলো। যখন কার্যক্রম বেশ জমে গেছে তখন ও সুজিতদাকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, সুজিতদা, যত রাতই হোক, ২৬ নম্বরের সতরঞ্চিগুলো কিন্তু পৌঁছে দিয়ে আসতেই হবে। নইলে প্রচারকরা মেঝেতে শুতে বাধ্য হবেন।'' এই হচ্ছে মিন্টু। যার প্রাণের সরস স্পর্শ বাংলার সর্বত্র স্বয়ংসেবকেরা পেয়েছেন।

স্বস্তিকায় প্রকাশিত লাঠি হাতে গণবেশ পরিহিত এবং চেয়ারে উপবিষ্ট মিন্টুর শেষ সময়ের ছবিটা দেখে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি। কিন্তু এ কোন্ মিন্টু! তার এইরকম ছবি দেখার জন্য তো কোনোদিন প্রস্তুত ছিলাম না। বয়সে বড় হয়েও তাকে আমার নতমস্তক প্রণতি। ও আমাদের হারিয়ে দিয়েছে! ■

সবাইকে নিয়েই ভারত গড়তে চায় সঙ্ঘ : ভাগবত

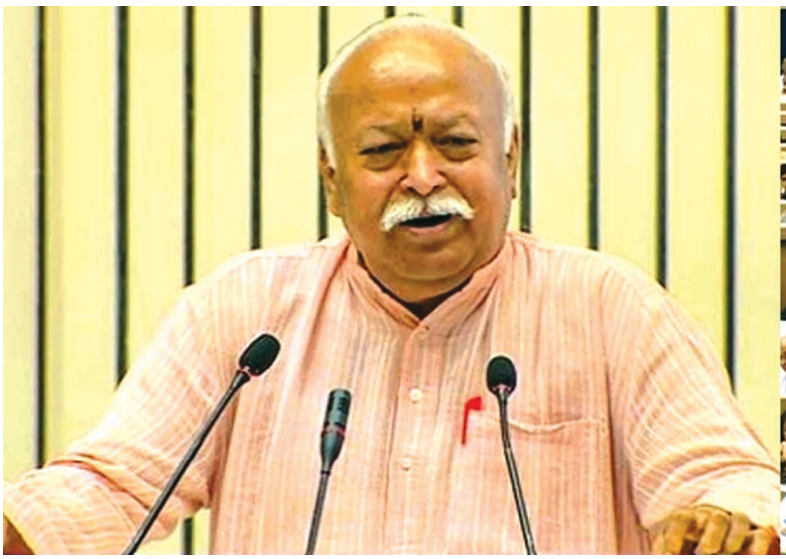

নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ সবাইকে সঙ্গে নিয়েই এক ভারত গড়ার পক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। কাউকে বাদ দিয়ে ভারত গড়ার পক্ষে নয়। বলেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। সম্প্রতি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'ভারতের ভবিষ্যৎ— আর এস এসের দৃষ্টিভঙ্গিতে' শীর্ষক তিনদিনের এক আলোচনা চক্রে ভাষণ দিতে গিয়ে একথা বলেছেন সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। তাঁর এই ভাষণে, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতির বার্তাই উঠে এসেছে। সরসঙ্ঘচালক বলেছেন, আর এস এস সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলার সংস্কৃতিতেই বিশ্বাস করে। যদি কোথাও কোনও বিরোধিতা থেকে থাকে, তবে সেটাও তথ্য এবং যুক্তিনির্ভর বিরোধিতা হোক— বলেছেন তিনি। দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত এই আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বিশিষ্টজনদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এমনকী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আলোচনা চক্রের উদ্দেশ্যই ছিল— পারস্পরিক মত বিনিময়।

সরসঙ্ঘচালক তাঁর ভাষণে বলেন, 'সঙ্ঘের কাছে কেউ পর নয়। আজ যাঁরা আমাদের বিরোধিতা করছেন, তাঁরাও আমাদের পর নন। তবে, এদের বিরোধিতা থেকে আমাদের যাতে কোনও ক্ষতি না হয়— সে বিষয়ে চিন্তা আমরা নিশ্চয়ই করব। মোহনজী বলেন, ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর, দেশের অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্বরা একটিই চিন্তা করেছিলেন। ওই সংগ্রামের ভিতর দিয়ে কেন স্বাধীনতা অর্জন করা গেল না— এই চিন্তাই তাদের আলোড়িত করেছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁরা এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে, দেশের মানুষের ভিতর তখন রাজনৈতিক সচেতনতা এবং রাজনৈতিক বোঝাপড়ার অভাব ছিল। তার পরই কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে সারা দেশে বড় আন্দোলনের জন্ম হয়। কংগ্রেসের এই আন্দোলনে অনেক সর্বত্যাগী মহাপুরুষ অংশ নিয়েছিলেন। আত্মত্যাগ করেছিলেন। এই সর্বত্যাগী মহাপুরুষরা এখনও আমাদের কাছে অনুপ্রেরণাস্বরূপ। তাঁদের সেই আদর্শই দেশকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারকে আর এস এস নিয়ন্ত্রণ করে— বিরোধীদের এই অভিযোগ সম্পর্কে সরসঙ্ঘচালক বলেন, 'রিমোর্ট কন্ট্রোল— এই কথাটা এখন খুব চলছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, বিজেপিতে যাঁরা সরকার চালাচ্ছেন— তাঁরা সব আর এস এসের স্বয়ংসেবক। সঙ্ঘ থেকে তাঁরা তাঁদের চিন্তাভাবনার রসদ পান। সঙ্ঘ যে কোনওরকম বিচ্যুতির দিকে কড়া নজর রাখে। যেহেতু তাঁরা স্বয়ংসেবক, কাজেই প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। একে অপরের কাজে সহায়তা করেন। তারা একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভাবনার আদানপ্রদান করেন।

সরসঙ্ঘচালক বলেন, সঙ্ঘ আজ সারা দেশেই একটা শক্তি। সমগ্র দেশই এটা বুঝতে পারছে। যখনই কারো কাজের পরিধি এবং প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে, তখনই সে একটা শক্তি হয়ে ওঠে। কেউ কেউ এই শক্তিকে ভয় করে। যারা ভয় করে, তারাই নানা ধরনের অপপ্রচার করে। এই ধরনের অপপ্রচারের জন্যই, গড় কুড়ি বছর ধরে আর এস এস যা যা কাজ করেছে, তা সবকিছুই নথিবদ্ধ করে রাখছে।

মোহনজী বলেন, 'আর এস এস কখনও দমন নীতিতে বিশ্বাস করে না।' সঙ্ঘ বিশ্বাস করে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের ভিতর দিয়েই দেশ অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে।

আর এস এস জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানায় না— বিরোধীদের এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সরসঙ্ঘচালক বলেন, 'সঙ্ঘ জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানানো সত্ত্বেও এই প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। আমরা আমাদের শাখায় গেরুয়া ধ্বজ উত্তোলন করি। তার মানে এই নয় যে আমরা জাতীয় পতাকাকে অসম্মান করি। বরং জাতীয় পতাকাকে তার জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিটি স্বয়ংসেবক শ্রদ্ধা জানিয়েছে।

প্রতি পাঁচদিন অন্তর মারা যান একজন সাফাইকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এখন পর্যন্ত, পাঁচদিন অন্তর সেপটিক ট্যাঙ্ক এবং ভূর্গভস্থ নর্দমা পরিষ্কার করতে গিয়ে গড়ে একজন করে সাফাইকর্মী মারা গিয়েছেন। এই হিসাব সারা দেশের। এই তথ্য দিয়েছে ন্যাশনাল কমিশন ফর সাফাই কর্মচারিজ (এন সি এস কে)। সংসদে একটি আইন পাশ করে সাফাই কর্মীদের নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য এই কমিশন গঠন করা হয়েছে। কমিশন সাফাই কর্মীদের মৃত্যুর যে হিসাব দিয়েছে তা মূলত বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট এবং কয়েকটি রাজ্য সরকারের দেওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে।

কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭-র জানুয়ারি থেকে এই পর্যন্ত এই ঝুঁকিবহুল কাজ করতে গিয়ে সমগ্র দেশে ১২৩ জন সাফাই কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। শেষ এক সপ্তাহে দিল্লি এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছ'জন সাফাইকর্মী প্রাণ হারিয়েছেন। তবে, এই সংখ্যাটি বেশি হতে পারে বলে মনে করছে কমিশন। কারণ, অনেক তথ্যই পাওয়া যাচ্ছে না। ভূগর্ভস্থ নর্দমা এবং সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার কাজে কতজন সাফাই কর্মী সারা দেশে নিযুক্ত আছেন— তারও কোনও সঠিক পরিসংখ্যান নেই বলেই কমিশন জানিয়েছে। মাত্র ১৩টি রাজ্য থেকে সাফাই কর্মীদের মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে বলে কমিশনের অভিমত। কমিশনের এক মুখপাত্র বলেছেন, ১৯৯৩ সালের আইনে পরিবর্তন আনার পরেও শহরে ভূগর্ভস্থ নর্দমাগুলি থেকে অনেক ক্ষেত্রেই যান্ত্রিক উপায়ে ময়লা নিষ্কাশন করা হয় না। কিন্তু কতগুলিতে পুরনো উপায়েই ময়লা নিষ্কাশন করা হচ্ছে তার কোনও তথ্যও রাখা হয় না। ফলে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলেও তা অজানা থেকে যাচ্ছে।

জে এন ইউতে জেতার পর তাণ্ডব মাওবাদীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আরও মারমুখী হয়ে উঠেছে মাওবাদীরা। মাও-দুষ্কৃতী তাণ্ডবে জে এন ইউ-এ অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের বহু ছাত্র আহত হয়েছেন বলে খবর। পরিষদ-নেতা সুজল যাদবের ওপর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উপর্যুপরি দু'দুবার আক্রমণ চালানো হয়। ফল ঘোষণার আগেই মাওবাদীরা বেধড়ক মেরে তার হাত হাত ভেঙে দিয়েছিল। অভিযোগ, ফলাফল ঘোষণার পরে জে এন ইউ ছাত্র-সংসদের বিদায়ী সভাপতি গীতা কুমারী ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী অঙ্কিত সিংহের নেতৃত্বে একদল মাও-দুষ্কৃতী, যাদের মধ্যে বহু বহিরাগতও ছিল ফের আক্রমণ চালায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফের তাদের রোষের শিকার হন সুজল।

হাতে প্লাস্টার থাকা অবস্থাতেই তার ওপর নৃশংস আক্রমণ চালানো হয়। মুকুল ও রাজেশ্বরকান্ত নামে আরও দুই এবিভিপি কর্মী এদের মারে গুরুতর জখম হন। অথচ বাংলা মিডিয়া ফলাও করে প্রচার করছে জে এন ইউ ক্যাম্পাসে হামলা চালিয়েছে এবিভিপির ছাত্ররা। প্রকৃত ঘটনার উলটো খবর দিয়ে তারা জাতীয়তাবাদী ছাত্রসংগঠনটিকে জনসমক্ষে হেয় করার চেষ্টা করছে।

এরই মধ্যে পুলিশে মাও-দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। আটক করা হয়েছে অঙ্কিত সিংহকে। জে এন ইউ-এর মাওবাদী ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন বা আইসার সক্রিয় সদস্য অঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের গবেষণারত ছাত্র। দিল্লির রামলাল আনন্দ কলেজে থাকাকালীনও আইসার পক্ষে গণ্ডগোলে জড়িয়েছিল সে। একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে, যাতে দেখা যাচ্ছে ধারালো অস্ত্র, লাঠি নিয়ে জে এন ইউ-এর মাওবাদীরা তাড়া করেছে এবিভিপির ছাত্রদের। অঙ্কিতকেও ওই ভিডিওতে লাঠি হাতে দুষ্কৃতীদের নেতৃত্ব দিতে দেখা গিয়েছে।

তবে শুধু জে এন ইউ-তেই নয়, এই হামলার রেশ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়েছে। জে এন ইউ-এর ফলাফল ঘোষণার পরদিনই সকালে প্রেসিডেন্সি কলেজের পেরিয়ার হোস্টেলে হামলার উদ্দেশ্যে মাওবাদী ছাত্ররা ভিড় করে। তবে দরজা বন্ধ থাকায় বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। সূত্রের মতে এই হামলা পূর্ব-পরিকল্পিত। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার্থী পরিষদের জয়ের পরেই জে এন ইউ-তে পরিষদের বিরুদ্ধে হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সেই মতো জে এন ইউ-এ ভোট গণনার দিন রাতে এবিভিপির বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত হামলার অভিযোগ আনা হয়। যাতে করে জয় সেলিব্রেশনের নামে তাদের হামলাকে আড়াল করতে পারে মাওবাদীরা।

স্বচ্ছতাই প্রকৃত সেবা ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ স্বচ্ছ ভারত অভিযানে দেশব্যাপী জনগণের অংশগ্রহণ বাড়াতে এবং পরিচ্ছন্ন ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'বাপু'-র স্বপ্নপূরণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ১৫ সেপ্টেম্বর 'স্বচ্ছতাই প্রকৃত সেবা' অভিযানের সূচনা করে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের ১৭ টি স্থানের সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মত বিনিময় করেন।

কথোপকথনের সময় প্রধানমন্ত্রী সকলের সঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সাফল্যের কথা ভাগ করে নেন। এর মধ্যে ছিল বিগত চার বছরে দেশের ৪৫০ টি জেলা প্রকাশ্য স্থানে শৌচকর্ম মুক্ত হয়ে ওঠা, ২০ টি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে প্রকাশ্য স্থানে শৌচকর্মমুক্ত হওয়ার কথা। তিনি বলেন, শৌচাগার বা ডাস্টবিনের সুবিধা প্রদান করাই যথেষ্ট নয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টিকে অভ্যাস হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। এই অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য সারা দেশের মানুষ এই অভিযানে শামিল হচ্ছেন।

অসমের ডিব্রগড়ের এক স্কুল পড়ুয়া তাদের স্কুল চত্বর পবিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য নিজেদের অবদানের কথা প্রধানমন্ত্রীকে শোনায়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যুব সমাজ সামাজিক পরিবর্তনের দূত। তাদের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন।

স্বচ্ছতার লক্ষ্যে নিজেদের উদ্যোগের কথা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য গুজরাটের মেহসানার দুগ্ধ ও কৃষি সমবায় সমিতিগুলির সদস্যরাও একত্রিত হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী জানান, স্বচ্ছ ভারত অভিযানের দরুন ডাইরিয়ার মতো রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস পেয়েছে।

মুম্বই থেকে বিশিষ্ট অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন জানান, মুম্বইয়ে এক সমুদ্রসৈকতের পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি একাধিক অভিযানে তিনি শামিল হয়েছেন। বিশিষ্ট শিল্পপতি রতন টাটাও মত বিনিময়ে অংশ নিয়ে বলেন, এমন একটি অভিযানে তিনি অংশ নিতে পেরে সম্মানিত বোধ করছেন। এই মত বিনিময় অনুষ্ঠানে সঞ্জয় গুপ্তা-সহ দৈনিক জাগরণের প্রবীণ সাংবাদিকরা নয়ডা থেকে অংশগ্রহণ করেন। স্বচ্ছ ভারত অভিযানে তাঁরা তাঁদের প্রয়াসগুলির কথা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভাগ করে নেন। লাদাখের প্যানগং হ্রদ থেকে আইটিবিপি-র জওয়ানরা মত বিনিময়ে অংশ নেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের সাহসিকতা ও দেশের প্রতি সেবার প্রশংসা করেন।

কোয়েম্বাটুর থেকে সদ্‌গুরু জাগ্গি বাসুদেব মত বিনিময়ে অংশ নিয়ে বলেন, সেখানে স্বচ্ছতা অভিযানের ব্যাপারে মানুষের খুব উৎসাহ রয়েছে। 'স্বচ্ছতাই প্রকৃত সেবা' আন্দোলনের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর প্রসংসা করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই অভিযান কোনও প্রধানমন্ত্রী বা সরকারের অভিযান নয়, এটি সমগ্র জাতির অভিযান।

ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া ও তামিলনাড়ুর সালেম থেকে মহিলারা তাঁদের বিভিন্ন প্রয়াসের কথা প্রধানমন্ত্রীকে শোনান। পাটনা গুরুদ্বারা থেকে ধর্মীয় গুরু এবং সাধারণ মানুষ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মত বিনিময় করেন। মধ্যপ্রদেশের রাজগড়ের সাধারণ মানুষের সঙ্গেও প্রধানমন্ত্রী মত বিনিময় করেন। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ-সহ ফতেপুরের মানুষ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মত বিনিময় করেন। বেঙ্গালুরু থেকে মত বিনিময়ে যোগ দেন শ্রীশ্রী রবিশঙ্কর। উত্তর প্রদেশে বিজানোরে গঙ্গা পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে যুক্ত স্বেচ্ছাসেবীদের সঙ্গেও প্রধানমন্ত্রী মত বিনিময় করেন। গঙ্গাতীরে বসবাসকারী সমস্ত মানুষকে প্রধানমন্ত্রী মা গঙ্গাকে পরিষ্কার রাখার আহ্বান জানান। আজমের শরিফ দরগা থেকে বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমান এবং হরিয়ানার রিওয়ারি থেকে রেলকর্মীরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মত বিনিময় করেন। কোল্লাম থেকে মত বিনিময়ে অংশগ্রহণ করেন মা অমৃতানন্দময়ী।

অনুষ্ঠানের শেষে প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছতাগ্রহীদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, তাদের কথা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ফারাক্কা ব্যারেজ আবাসনে বিশ্বকর্মা প্রতিমা ভাঙল দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পূজার আগেই ভোরে ফারাক্কা ব্যারেজের আবাসনে বিশ্বকর্মা প্রতিমা ও মণ্ডপ ভেঙে দিল দুষ্কৃতীরা। খুব ভোরে বিষয়টি সবার চোখে পড়ে। এর পরই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়।

টেক্সম্যাকো রেল ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড ফারাক্কা ব্যারেজের লকগেট মেরামতির দায়িত্বে রয়েছে। কোম্পানির কর্মীরাই বিশ্বকর্মা পূজার আয়োজন করেন। সংস্থার প্রোজেক্ট ম্যানেজার মনোজ চক্রবর্তী বলেন তাঁরা কয়েক মাস ধরে ফারাক্কা ব্যারেজের লকগেট মেরামতির কাজ করছেন। তাই কর্মীরা এই পূজার আয়োজন করেন। খুব সকালেই দেখা যায় কে বা কারা প্রতিমা ও মণ্ডপ ভেঙে ফেলেছে। এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ফারাক্কা থানার পুলিশ জানিয়েছে তাঁরা তদন্ত শুরু করেছেন। ঘটনার জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন সংস্থার কর্মীরা।

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৫

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

দেবী প্রসঙ্গ

স্বামী যুক্তানন্দ

উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত - অবেক্ষণ।। সুমিত্রা ঘোষ— কুসুম কুমারী
জিষ্ণু বসু—হাতি ঘোড়া পাল কী

উপন্যাসোপম কাহিনি

প্রবাল চক্রবর্তী - মাতৃরূপেণ সংস্থিতা

গল্প

এষা দে, রমানাথ রায়, শেখর বসু, সিদ্ধার্থ সিংহ, সন্দীপ চক্রবর্তী
গোপাল চক্রবর্তী, তাপস অধিকারী

ভ্রমণ

কুণাল চট্টোপাধ্যায়— রেনেসাঁর ভূমিতে

জীবন-কথা

জহর মুখোপাধ্যায় - মশাল হাতে সিংহ পুরুষ

প্রবন্ধ

ডা: অমূল্যরতন ঘোষ, অচিন্ত্য বিশ্বাস, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, জয় সেন, দেবীপ্রসাদ রায়, সারদা সরকার, সুদীপ বসু, অভিজিৎ দাশগুপ্ত, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত কুশারী, সৌমেন নিয়োগী

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

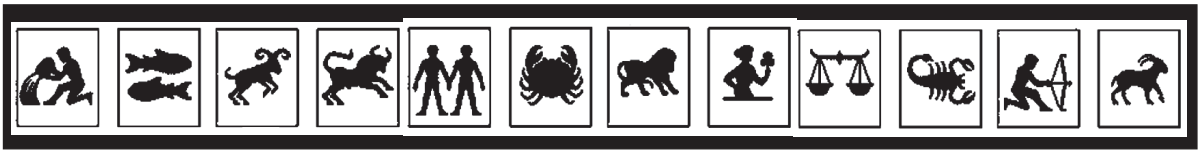

২৪ সেপ্টেম্বর (সোমবার) থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্কটে রাহু, কন্যায় রবি-বুধ, তুলায় বৃহস্পতি-শুক্র, ধনুতে শনি, মকরে মঙ্গল-কেতু। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র কুম্ভে পূর্বভাদ্রপদ থেকে বৃষে রোহিণী নক্ষত্রে।

মেষ : উৎসাহ, উদ্যম ও দৃঢ় প্রত্যয়ে কর্মজীবনে প্রবেশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা, বিলাস দ্রব্য ক্রয়, রুচিসম্মত পোশাক ও নিকটবর্তী স্থানে ভ্রমণের সম্ভাবনা। ক্যালকুলেটিভ আইডিয়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের মাপকাঠি। যুক্তি ও আবেগমিশ্রিত কথাবার্তায় নেতিবাচক প্রভাব। দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও নিম্নশ্রেণীর সেবায় উদার হৃদয়ের প্রকাশ।

বৃষ : শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ও পাণ্ডিত্যের প্রসার ও স্বীকৃতি। ইমারতি দ্রব্য প্রমোটারি, যানবাহন, খনিজদ্রব্য ও দালালি ব্যবসায় শুভ। কর্মক্ষেত্রে রমণীর কুহকজালে মানসিক অস্থিরতা। প্রিয়জনের নিকট সান্নিধ্য ও পুরাতন ঝামেলায় কলুষিত মন। গাড়ি-বাড়ি ও ব্যবসায় প্রাপ্তিস্থান শুভ। শরীরের নজরদারী ও উত্তেজনার পরিবেশ পরিহার করুন। পিতা ও পত্নীর শুভ।

মিথুন : জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ ও নতুন উদ্যোগে প্রতিভার স্বাক্ষর। কনিষ্ঠদের নিজ যোগ্যতায় কর্মসংস্থানের শুভ যোগ। যুক্তিসঙ্গত কথাবার্তায় বিরাগভাজন। জীবনসঙ্গীর দূরদর্শিতায় আয়ের নব-দিশার সন্ধান। সপ্তাহের প্রান্তভাগে সন্তানের মানসিক অস্থিরতা ও উত্তেজনা। আইনি জটিলতার অবসান।

কর্কট : সফল, উদ্যোগ, কর্মে স্বাচ্ছন্দ্য, স্বীয় উপস্থিতি ও বাক্‌চাতুর্যে সুহৃদ সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। অপ্রত্যাশিত স্বাচ্ছন্দ্য, গৃহসুখ ও ব্যয়াধিক্য যোগ। পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্তি তবে সম্পত্তি বিষয়ক জটিলতা দেখা যায়। পরিবারে অসুস্থতায় উপযুক্ত চিকিৎসায় বিলম্ব। কুটুম্বিতা বিঘ্নিত হতে পারে। বয়স্ক মিত্র এড়িয়ে চলুন।

সিংহ : কথাবার্তা, লিখিত কাজ ও প্রতিবেশী বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার, পরোপকার, ব্যক্তিত্বের জন্য, সাধুবাদ, সৃজনশীলতার প্রকাশ, গুরুজনের পরামর্শে নব দিশার সন্ধান। সপ্তাহের প্রান্তভাগে সবান্ধব ভ্রমণ। সৎকাজে ও সদগুরুর সান্নিধ্য। মনস্কামনা পূরণ।

কন্যা : দাম্পত্য অশান্তি। কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ, অধস্তনের নেতিবাচক আচরণ, বিশিষ্টজনের দ্বারা বিশেষ উপকৃতের সম্ভাবনা। শৌখিনদ্রব্য, বস্ত্র, ঔষধ, অলঙ্কার ব্যবসায় সফল বিনিয়োগ ও প্রাপ্তি। শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, সাংবাদিক ও প্রকাশকের সুনাম ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি। গ্যাস, অম্বল, মাথাধরা ও নিম্নাঙ্গের পীড়ায় সতর্কতা দরকার।

তুলা : শিল্পী, সাহিত্যিকের উন্নত রুচি-সংস্কৃতি-সুন্দরের পুজারি। কর্মক্ষেত্রে মহিলার কৌশলী মানসিকতায় সময়ের অপচয়। ভ্রাতা-ভগ্নি ও সন্তানের কর্মসংক্রান্ত সুখবর প্রাপ্তি। সপ্তাহের শেষভাগে রক্তচাপ বৃদ্ধি ও কর্মে অনীহা। ব্যয় বাহুল্যের টেনশন পরিহার করুন।

বৃশ্চিক : স্বজন বান্ধবের কারণে মনঃক্লেশ। মাতার স্বাস্থ্যহানি ও গৃহসুখ বিনষ্ট। সন্তানের চলাফেরায় আধুনিকতার ছোঁয়া, জেদ ও কর্তব্যে অবহেলা। ক্রীড়াবিদ, শল্যচিকিৎসক, রিপ্রেজেন্টেটিভ ও পাইলটদের গৃহ, জমি, গাড়ি ক্রয়ের যোগ বর্তমান। সপ্তাহের শেষভাগে সমালোচনা ও সম্মানহানি।

ধনু : স্বীয় প্রতিভায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সম্মান প্রাপ্তি। গণিতজ্ঞ, গবেষক, বিজ্ঞানী, সার্ভেয়ার, আর্কিটেকচার, চাটার্ড, আইটি সেক্টরে কর্মরতদের প্রতিভার ব্যাপ্তি ও মান্যতা। বিজাতীয় সংস্পর্শে কর্ম ও ব্যবসায় লগ্নি ও প্রসার। গৃহে মিত্র ও আত্মীয় সমাগম, হঠাৎ প্রাপ্তি হলেও ব্যয়াধিক্য যোগ। চোখ ও চর্মরোগের চিকিৎসা প্রয়োজন।

মকর : প্রশাসনিক কর্মে ন্যস্তদের দক্ষতা ও ব্যস্ততা বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রে জেদের কারণে গোপন অভিসন্ধির শিকার হবেন। ফলে কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা। ধৈর্যের সঙ্গে প্রতিকূল পরিবেশ প্রতিহত করুন। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ। সপ্তাহের শেষভাগে বহু ব্যঞ্জনের সমাহার, রমণীর সান্নিধ্য ও অদূর ভ্রমণ।

কুম্ভ : বিদ্বান, ভাগ্যবান, যানবাহন ও মিত্রলাভ, দেব-দ্বিজে ভক্তি, গুরুসেবা, জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থতায় প্রবাস, বেকারদের কর্মলাভের সংবাদ, শিল্প ও সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণীয় মনোভাব, বিলাসদ্রব্য ক্রয় ও ভোজন, অন্ত্যজ শ্রেণীর জন্য সামাজিকতা ও ভালো কাজে ভালো মনের মানুষের সান্নিধ্যলাভ।

মীন : আত্মীয়, প্রতিবেশী ও সহোদরের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। লাইফ পার্টনারের পদোন্নতি ও পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্তি। উচ্চপদস্থের সাধুবাদ, সৃজনশীলতার বাস্তবায়ন, ধর্ম ও দর্শনের আলোচনায় প্রশান্তি। কর্ম পরিবর্তন অথবা নতুন কর্মসংস্থানের যোগ। পিতার স্বাস্থ্য উদ্বেগের কারণ। জমা থেকে খরচ যোগ।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

শ্রী আচার্য্য